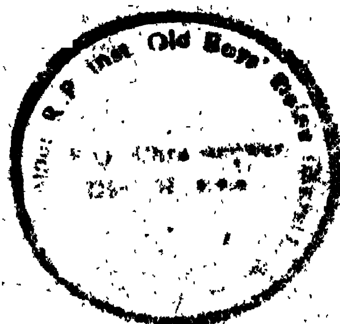
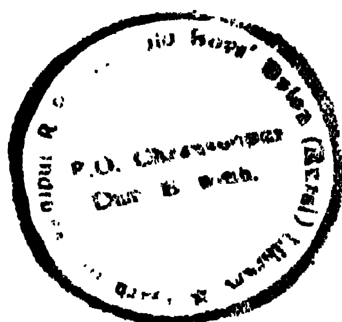

R.P. Inst. Old Boys'


Old Boys'




Old Boys'

নূতন প্রভাত

তিন অঙ্কে সমাপ্ত প্রগতি-নাট্য

শ্রীমনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫০
দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫১

—এই লেখকের লেখা—

ভুলি নাই (৪র্থ সংস্করণ)

উপন্যাসে বিপ্লবযুগের কাহিনী

*

দুঃখ-নিশার শেষে (২য় সংস্করণ)

সর্বাধুনিক প্রগতি-গল্প

*

একদা নিশীথকালে (২য় সংস্করণ)

হাস্যমধুর সচিত্র গল্পস্তবক

*

পৃথিবী কাদের ? (২য় সংস্করণ)

নবযুগের গল্প-গ্রন্থন

*

নর-বাঁধ (২য় সংস্করণ)

সেকাল ও একালের অতুলন আলেখ্য

*

বনমর্ম্মর (২য় সংস্করণ)

বাংলা-সাহিত্যের স্মরণীয় গল্পগ্রন্থ

*

দেবী-কিশোরী

রোমাণ্টিক গল্পপ্রচয়

*

প্লাবন

নাট্যভারতীতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে—

যাঁর লেখনী থেকে সর্বপ্রথম আমরা আধুনিক-নাটক পেয়েছি



চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

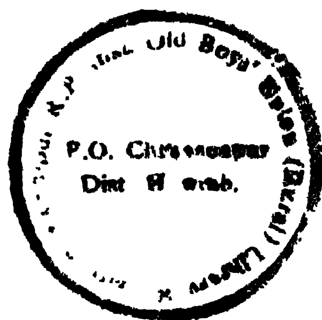
শশাঙ্ক	...	দেশকর্মী
মহেশ্বর	...	জমিদার
হলধর	...	গোমস্তা
বিশু	...	বরকন্দাজ
রায়সাহেব	...	সরকারি উকিল
অচ্যুত	...	রায়সাহেবের সঙ্গী
আকবর আলি, প্রবীর, সন্তোষ	...	দেশকর্মী
আমিনুল হক	...	দারোগা
রমেন	...	সহকারী দারোগা
মওলা বক্স	...	জমাদার
নীলমণি সাঁপুই	...	ফিসারির মালিক
রহিম, কান্তরাম, অমূল্য, বঙ্কু	...	কৃষক

জেলার, ডাক-পিয়ন, পাইক, সরকার ইত্যাদি

নারী

মা

অরুন্ধতী	...	মহেশ্বরের মেয়ে
আমিনা	...	রহিমের স্ত্রী
যামিনী	...	কান্তরামের মেয়ে
ক্ষান্ত	...	কান্তরামের বোন
চন্দ্রমুখী	...	মহেশ্বরের স্ত্রী
মনোরমা, সুনন্দা	...	অরুন্ধতীর বান্ধবী



বন্দী মানুষ

পর্দা উঠল

অন্ধকার। গান শোনা যাচ্ছে—

কাঁটার মুকুট মাথায় পরা, দু'হাত বাঁধা নাগপাশে।
কাতর রাত্রি ক্লান্ত দিবা একের 'পরে আরেক আসে।
বাসতো ভাল এই মানুষে, এই মাটিরে—
মাটি থেকে সরিয়ে নিল পাঁচিল ঘিরে ;
একটি মানুষ—বন্ধু অরি—কেউ যদি হায়
থাকত পাশে !'

অন্ধকার ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হচ্ছে। গান মৃদু হয়ে আসছে।

[দৃশ্যের মধ্যে বরাবরই অতি মৃদু স্বরে গান চলবে]

প্রথম দৃশ্য

জেলের ফটক

প্রকাণ্ড আলা জ্বলছে। বাইরের দিক থেকে এসে জেলার তালা খুললেন। তাঁর সঙ্গে এক বর্ষীয়সী মহিলা। ফটক খুলে গেল। মোটা মোটা লোহার গরাদে—তার ওদিকে শশাঙ্ক।

জেলার। শশাঙ্কবাবু, আপনার মা দেখা করতে এসেছেন।

জেলার একটু দূরে টুলের উপর বসলেন।

মা। কেমন আছিস বাবা ?

শশাঙ্ক। ভাল, খুব ভাল—

মা। চেহারা দেখে তা বুঝতে পেরেছি—

শশাঙ্ক। সত্যি মা, বেশ লাগছে আজকাল। বাইরে যখন ছিলাম, অবস্থা দেখে মন খারাপ হত। ক্ষেপে যেতাম। এখানে জেলের মধ্যে শান্ত হয়ে সকল দিক ভাবতে পারছি। ...রাতের অন্ধকার দেখে

আমরা ভয় পাই মা, সামনে যে নতুন প্রভাত! মানুষে মানুষে হানাহানি, দু-চারজনের সুখ-সুবিধায় বহুজনের নিষ্পেষণ—এই কলঙ্কিত যুগের অবসান হয়ে এলো। মুক্তি আসছে, দেশে দেশে জনগণের মুক্তি! …ও কি মা, তোমার চোখে জল?

মা। কই, না। আমি হাসছি। তুই বেশ আছিস দেখে আমি হাসছি। এই দেখ…আমি হাসছি।

শশাঙ্ক। মা, মাগো, তোমার চোখে জল দেখলে আমার ধৈর্য থাকবে না। যত তফাতেই থাকো, অহরহ তুমি আমার বুকে সাহস দিচ্ছ। ফুলের মালা পরিয়ে সকলে আমায় জেলে পাঠিয়েছিল, এই দেখ তা শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। মানুষের জয়ধ্বনি জেলের পাঁচিল ভেদ করে কানে পৌঁছয় না। কিন্তু মা, তুমি যে শান্ত মুখে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলে, সেটা ছবি হয়ে চোখের সামনে ফুটে আছে। তুমি কেঁদো না।

মা। চুপ কর শশাঙ্ক, চুপ কর। তোর বন্ধুবান্ধব সহকর্মী কেউ এখন দেখছে না। এ আমাদের মায়ে-ছেলের কান্না। এখন এই মুহূর্তে তুই আর জননেতা শশাঙ্ক নোস, দুঃখিনী বিধবার একমাত্র ছেলে! …আমায় কাঁদতে দে বাবা, চুপি চুপি একটুখানি কেঁদে নিই—

শশাঙ্ক। সত্যি মা, তোমায় কত দুঃখ দিলাম! কোন সাধ তোমার পূরণ করতে পারলাম না। চিরদিন বন্দিশালায় কেটে গেল। গরাদের বাইরে হাসিকান্নায় সুখে-দুঃখে পৃথিবীর জীবনধারা বয়ে যাচ্ছে, বর্ষা আসছে, বসন্ত আসছে—আমাদের কেবল রাতের পর দিন, আর দিনের পর রাত। ঐ নিমগাছের দুটো মাত্র ডাল দেখা যাচ্ছে আর ঐ একটুকরো আকাশ। দেখে দেখে আমার মতো কতজন এই

জায়গাটুকুর মধ্যে কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বুড়ো হয়ে মৃত্যুতে মিলিয়ে গেছে। তাদের মতো আমিও চলে যাবো। আর দশটি মায়ের মতো মনে মনে তুমি মা কত আশা গড়েছিলে, সব আমি চুরমার করে দিলাম।

মা। না বাবা, তা নয়। আমি কাঁদি কেন জানিস? বড় দুর্ভাগা দেশে জন্মেছিস তোরা। এখানে দেশকে ভালবাসা পাপ—নিখিল মানুষের মঙ্গল-কামনা মস্ত অপরাধ। তুই আর তোর মতো আমার আরও হাজার হাজার ছেলে জেলের অন্ধকারে পচে মরছিস, অন্য দেশ হলে ইতিহাসে চিরজীবী জায়গা হয়ে যেত—আর এখানে কেউ ভাবে না তোদের কথা, কেউ জানেই না—

শশাঙ্ক। না জানুক—তবু মা, বিজয়ী আমরা। আমাদের না ভাবুক, আমাদের মনের ভাবনা আজ সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। মনের চেহারা দেখা যায় না মা,—নইলে দেখতে পেতে যে জজসাহেব আমাকে জেলে পাঠিয়েছে, বিচার করবার সময় মনে মনে সে-ও শিউরে উঠেছিল। ··পুরানো বিধিব্যবস্থায় ঘুন ধরে গেছে, জোড়াতালিতে চলছে না আর, আগাগোড়া পালটাতে হবে। এই নতুন চেতনা আজকে মানুষের মনে মনে।

মা। কি বলিস? বয়ে গেছে? ক'জন ভাবে এসব?

শশাঙ্ক। ভাবে বই কি মা! দুটো-চারটে অন্ধ জড় পুতুলের কথা ছেড়ে দাও। মানুষের মতো মানুষ সুস্থ নিরুদ্বিগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছে—এত বড় দেশের মধ্যে এমন তুমি একটাও খুঁজে পাবে না মা।

গরাদের ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে শশাঙ্ক মার চোখ মুছিয়ে দিল।

শশাঙ্ক। আমাদের কথা তুমি ভেবো না। কে আমরা? জন-প্রবাহের এক একটা কণিকা।...তুমি আমাদের সমিতির খবর বল।

মা। সমিতি আছে, কিন্তু দলাদলি। মুসলমান চাষীরা আসছে না।

শশাঙ্ক। কেন?

মা। তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে, তেলে জলে মিশতে পারে—কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে মিল হবে না। একেবারে আলাদা জাত। রহিম পর্যন্ত দল ছেড়েছে।

শশাঙ্ক। আমাদের রহিম?

মা। নতুন এক দারোগা এসেছেন থানায়। গোঁড়া মুসলমান, ভয়ানক স্বজাতি-বৎসল। তার সঙ্গে রহিমের ধর্মসম্পর্ক হয়েছে। তাঁর কথায় ওরা ওঠে বসে।

শশাঙ্ক। ঘোষ-কাকাবাবুর তা হলে বড় স্ফূর্তি—এতদিনে আশা পুরেছে।

মা। তা বলে রহিম তাঁকেও ছেড়ে কথা বলে না। এই তো গেল শ্রাবণে একদিন—

শশাঙ্ক। কি হয়েছিল?

মা। ঘরে জল পড়ছিল, রহিম গিয়েছিল খড় কর্জ চাইতে। ঘোষ ঠাকুরপো বললেন, ঘর ছেয়ে দরকার কি? আমার দালানের পাশের জায়গা—এ ভিটে ছেড়ে দিয়ে তুই চরের উলুবনে ঘর বাঁধ্‌গে। জমি দেবো, ঘরও বেঁধে দেবো। আমার সুবিধে হবে, তোরও সুবিধে। ধারালো ছুরির মতো অমনি রহিমের জবাব—

শশাঙ্ক। কি?

মা। বলল—হুজুর, উলুবনে বরঞ্চ আপনিই নতুন ইমারত বানিয়ে

নিনগে। আপনার ভিটেও তো আমার ঘরের লাগোয়া। আমার সুবিধে হবে।

শশাঙ্ক। সমিতি ছাড়লেও রহিম তো মত ছাড়ে নি মা।…সে নিঃস্ব নিরন্ন, কিন্তু ইজ্জত নিয়ে চলতে জানে। রহিম আমাদেরই দলে মা, সে এখনও আমাদের—

জেলার হাতঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

জেলার। সময় হয়ে গেছে।

শশাঙ্ক। মা, আমায় আশীর্বাদ করো তেমনি করে। তোমার হাত রাখো আমার মাথায়।

জেলার। টাইম ইজ আপ শশাঙ্কবাবু—

মা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বারবার তাকাচ্ছেন শশাঙ্কের দিকে। অন্ধকার হয়ে আসছে। অলক্ষ্যের গান আবার স্পষ্ট হতে লাগল—

কণ্ঠ রোধ করেছে কঠিন লৌহদ্বার—
ভাবনা তোমার ভাবছি তবু মনে মনে ;
শিকলের ঝনঝনিতে ডরে না চিত্ত আর,
প্রভাতের স্বপ্ন দেখি লক্ষ জনে—
মনে মনে।

হাতিয়ারে মানুষ মারে—
ভাবনা কি কেউ মারতে পারে ?
মুক্তির পদধ্বনি শুনি ঐ নীলাকাশে
বন্দী, রয়েছে সাথে ;—এই আমাদের পাশে পাশে।

দ্বিতীয় দৃশ্য ঘোষকর্তার বাইরের ঘর

ফরাসের উপর হাতবাক্স সামনে হলধর গোমস্তা। সম্মুখে চাষী প্রজারা।

হলধর। টাকা চাই। শুধু ঐ বদন-চন্দ্র দেখবার জন্য উতলা হয়ে ডেকে পাঠাই নি, মাণিক আমার। টাকা—টাকা…টাকা নিয়ে এসো।

অমূল্য। এখনো ধান কাটা শেষ হল না। চোত কিস্তির আগে এক পয়সাও দিতে পারব না, গোমস্তামশাই।

হল। কর্তামশায়ের মেয়ের বিয়ে। বিয়ে কি চোত অবধি মুলতুবি থাকবে? তোমাদের জনে জনের কাছে তিনি দায় জানিয়েছেন। খাজনা বলে না হয়, চাঁদা হিসেবেও তো কিছু কিছু নিয়ে এলে পারতে। …তুমি এনেছ উমেশ মোড়ল? তুমি বিশ্বাস আলি? চুপ করে আছ, কিচ্ছু আনোনি? তুমি? তুমি? তুমি?… কেউ আনো নি?……হ্যাঁ, কি বলছ যদু, আমায় বল না।

যদু। আমি কিছু বলছি নে গোমস্তামশাই—

হল। তুমি বলছ না, কে বলছে শুনি?

যদু। আজ্ঞে, আমার পরিবার বলছিল, আমাদের চাঁদায় মেয়ের বিয়ে হবে—ঘোষকর্তা তা হলে আমাদের চেয়ে গরিব?

হল। বুঝেছি বাপু, বুঝেছি। বলাবলি হচ্ছে বটে ঐ রকম কথা। তোমার পরিবার নয় মোড়ল, বলে বেড়াচ্ছে বন্দেমাতরম্-ওয়ালারা।… উঠোনের মাঝখানে ঐ দুটো সুপারিগাছ। কেন বলতে পারো, যদুবর? পারো না।…স্বর্গীয় কর্তাদের আমলে বেয়াড়া প্রজাদের ঐ গাছে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে রাখা হত। হাল-বকেয়া খাজনা মায় সুদ-খরচা

জহরি-পরবি শোধ হয়ে গেলে তবে ছুটি! এখন তো রাম-রাজত্বে আছ, কর্তামশাই ঋষি-তপস্বী মানুষ। তাই পিপীলিকার পাখা গজাচ্ছে। তুমি তবু পরিবারের জবানি বললে—নৈচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার মতন; রহিম মিঞা খোসা ফেলে মুখের উপর শক্ত কথা শুনিয়ে দিল। কিন্তু বাবা, যত বাড় বেড়ে থাক, পিঁপড়ে বাপ্তোর—একটি মাত্র চাপড়ের ওয়াস্তা। কর্তামশাই একে ভূস্বামী, তায় ধর্মগত-প্রাণ—তাঁর মুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে—ভিটে রহিমকে ছাড়তেই হবে, আর বিয়ের চাঁদাও তোমরা বাপের সুপুত্তুর হয়ে দিয়ে যাবে। তবে আঙুল না বাঁকালে ঘি বেরোয় না...দু-চারদিন সময় লাগতে পারে।

অমূল্য। রহিম নতুন করে ঘর ছাচ্ছে আবার।

হল। অতি উত্তম কাজ করছে। আমাদের কাজটা এগিয়ে রাখছে। খুকিদিদির বিয়ের সময় ওখানে বেহারা-বাজনদার বসাব।...কান্তরাম মোড়ল, তুই চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে—তুইও কি এদের দলে?

কান্ত। আমি তোমাদের দলে, গোমস্তামশাই। ষোল আনার উপর আঠারো আনা। যা বলবে তাই করব।

হল। টাকা?

কান্ত। দেবো, নিশ্চয়ই দেবো। খাজনা দেবো, চাঁদা দেবো, ধান-চাল বিক্রি করে সমস্ত এনে দেবো। শুধু দুটো মাসের সময় চাচ্ছি—অঘ্রান আর পৌষ।

হল। দুটো দিনের সময় দিতে পারি বড় জোর। সাতশো টাকা তের আনা সাড়ে বার গণ্ডার ডিক্রি তোর নামে।

কান্ত। এখন কাঁচা-ধান বেচলে মোটে দর পাওয়া যাবে না। দয়া করতেই হবে, দয়াময়—

হল। বটে!

কান্ত। দয়ার সমুদ্দুর তুমি—

হল। খাল নয়, বিল নয়, একেবারে সমুদ্দুর? বলিস কি?

কান্ত। দশে ধর্মে বলে যাকে—

হল। দশে ধর্মে বলে না, যারা জাঁতিকলে পড়েছে—তারাই শুধু বলে। আহা ঘাড় নাড়িস কেন মোড়ল? মিছে কথা নয়—বেকায়দায় না পড়লে কি চিঁ-চিঁ আওয়াজ বেরোয়? তালুকদারের তহশিল করি বাপু। চারটে করে কান রাখতে হয়। দুটো এই তোরা দেখতে পাচ্ছিস মাথায় বসানো। আর দুটো পিঠের উপর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলে গুণের ফিরিস্তি দেয়। সামনের দু-কানে শুনতে শুনতে আৎকে উঠি, বাপু রে বাপ—এত গুণের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি কেমন করে! আবার আড়ালে-আবডালে যেসব সম্পর্ক পাতাতে পাতাতে যাস, তা-ও শুনি পিঠের কান দুটো দিয়ে।

কান্ত। ছি-ছি! আমি সে লোক নই।

হল। তা ন'স। হতিস নিশ্চয় যদি ডিক্রিটা না থাকত। মানুষ মাত্রেই ছ্যাঁচড়া—ঠেকনো দিয়ে সিধে রাখতে হয়।

নীলমণি সাঁপুই প্রবেশ করল।

এই যে আসতে আজ্ঞা হোক, সাঁপুইমশায়। ওরে বিশে, কর্তামশায়ের খাসকামরায় নিয়ে বসা। আর অমনি খবর দিয়ে আয় বাড়ির মধ্যে।··· আপনি বসুন গে। কে আছিস, তামাক সাজ্। আর দাঁড়িয়ে কেন, বাপসকল? কন্ধে বন্দেমাতরমের ভূত ভর করেছে, বুঝতে পেরেছি। ভূত-তাড়ানোর ওঝা ডাকা হচ্ছে। চোখের জলের বন্যা বয়ে যাবে। ...যাও, বাড়ি যাও। বরঞ্চ বৈঠক ডেকে আর একবার শলা-পরামর্শ করোগে। মিছে দেরি করো না, যাও।

সকলে চলে গেল, রইল কেবল কান্তরাম।

হল। তুই?

কান্ত। (পা জড়িয়ে ধরল) পাদপদ্মে পড়ে রইলাম। দয়া করতেই হবে।

হল। বেশ, করব। অমন করে বলছিস যখন। কিন্তু দয়ারও বন্দোবস্ত চাই একটা—

কান্ত। বন্দোবস্ত?

হল। শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে না মোড়ল। গুড় দিতে হবে। হাঁা, গুড়। আট টাকা মাইনের গোমস্তাগিরি করছি। গুড় না থাকলে যে স্রেফ বাতাস খেয়ে থাকতে হত। ...চুপ চুপ, কর্তামশাই। সন্ধ্যের পর একবার আসিস। কর্তামশাই ঋষিতপস্বী মানুষ—তোর বিষয়ে বিবেচনা করবেন বই কি—নিশ্চয় করবেন। আমি বলব; বিশেষ করেই বলব।

মহেশ্বর এলেন। কান্তরাম তাঁকে গড় করে চলে গেল।

মহেশ্বর। বলছে কি?

হল। সুশীল সুবাধ্য প্রজা। কিন্তু কথায় তো পেট ভরবে না, মবলক বাকি। বিস্তর ধান পাবে এবার।...আমি বলি কি হুজুর, ডিক্রিজারি করে বেটার ধানগুলো ক্রোক করে রাখা যাক। কোন্ শালা কি রকম মতলব দিয়ে যায়, কিছু বলা যায় না।

মহেশ্বর: এদিককার আর খবর কি?

হল। আজ্ঞে, চাষারা বিলকুল সব ভদ্দোর হয়ে গেছে।

মহেশ্বর। বলি আদায়পত্তোর কি রকম? সিন্দুকে আজ উঠল কত?

হল। পঁচিশ টাকা সাড়ে সাত আনা। সর্বসাকুল্যে। ...ঐ যে বললাম, সব ভদ্দোর হয়ে গেছে। ভদ্দোরলোকের এক কথা—

চোত-কিস্তির আগে কিছু হবে না। না শোনেন, নালিশ করুনগে।

মহেশ্বর। তা হলে উপায় ? রায়-সাহেব অরুকে আশীর্বাদ করতে আসবেন। …তালুক বেচে দেশান্তরি হব নাকি, হলধর ?

হল। লোকসানি তালুক—টাকা দিয়ে কিনবে কোন আহাম্মক ? আর দেশান্তরি হয়েও রেহাই নেই হুজুর। দিল্লি দিল্লি গয়া কাশী—যেখানে যাবেন, বন্দেমাতরম্-ওয়ালারা ঘাঁটি করে বসেছে। তার চেয়ে আমার যুক্তিটা শুনুন। আমি বলছি কি—

ডাকপিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল।

পিয়ন। চিঠি—

মহেশ্বর। (চিঠি পড়ে) হলধর রায় সাহেব তেইশে তারিখে আসছেন। সেইদিন দিতে হবে পাঁচ হাজার। পাঁচ হাজার টাকা আমি চাই-ই। নইলে বিয়ে ভেঙে যাবে, আমি মুখ দেখাতে পারব না—

হল। সমস্ত হয়ে যাবে হুজুর। নীলমণি সাঁপুই এসেছে, ওঘরে বসিয়ে রেখেছি। পাকাপাকি করে ফেলুন। …আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল যুক্তিই দিচ্ছি। প্রজারা আমার মুখের দিকে চাইল না, আমরাই বা কেন চাইব তাদের দিকে ? কিসের খাতির ? …ডাকি নীলমণিকে—কি বলেন ?

মহেশ্বর। বাঁধ কেটে নীলমণি হাতীপোতার আবাদ ভাসিয়ে দেবে, আড়াই শ' ঘর গৃহস্থ ভেসে যাবে—

হল। কিন্তু আমরা বেঁচে যাব, হুজুর। তালুক বেচতে হবে না, দেশান্তরি হতে হবে না, অরুদিদির বিয়ের সময় বাজিতে বাজিতে আকাশে আগুন ধরিয়ে দেব, আমাদের গায়ে আঁচটি লাগবে।

না। যত বেটা সমিতিওয়ালা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এক ঢিলে একটা-দুটো নয়—একেবারে বিশটা পাখী খতম হবে। ...আমি ডেকে আনছি নীলমণিকে। নীলমণিবাবু, কর্তামশাই এসেছেন। নীলমণিবাবু—

ডাকতে ডাকতে হলধর বেরিয়ে গেল। তখনই নীলমণি:ক নিয়ে ফিরে এল।

মহেশ্বর। কি বলতে চাও তুমি?

নীল। হাতীপোতার ষোল-আনা যদি বন্দোবস্ত করেন, আমি রাজি আছি। এখানে কিসারি করব। শুনেছেন বোধ হয়, এই রকম আরও সাতটা জলকরের মালিক আমি। আপনার গোমস্তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে একরকম।

হল। হ্যাঁ। সমস্ত জানিয়েছি হুজুরকে। চব্বিশ হাজার টাকা বার্ষিক খাজনা। অর্ধেক আগাম, অর্ধেক বছরের শেষে। ...কিন্তু একটা কথা সাঁপুইমশায়, এই মঙ্গলবারের মধ্যে বায়না স্বরূপ অন্তত চাই পাঁচ হাজার।

নীল। মঙ্গলবার কেন, এখনই দিয়ে যাচ্ছি যা আছে। নিন—দু-হাজার আছে, গুণে নিন। প্রমট-পেমেন্টের দরুন আমার কারবারের এত সুখ্যাতি। ...দলিলপত্র রেজেষ্ট্রি করে বাঁধ কেটে যেদিন আমার দখল দেবেন, বাকি দশ হাজার সেই দিন দিয়ে দেব।

মহেশ্বর। গেল-বছর অনেক খরচা করে সমস্ত বাঁধ আগাগোড়া মেরামত করেছি—

নীল। বাঁধ বাঁধা শক্ত, কেটে দেওয়া খুব সোজা। দু-চার টাকার

ব্যাপার ? হাত দশেক ফাঁক করে দেবেন, নদীর নোনা জল আপনি পথ করে নেবে।

অরুন্ধতী প্রবেশ করল।

অরু। বাবা, ক'টা বেজেছে জানো ? চানটান করবে না আজ ?

মহেশ্বর। এই দু-হাজার টাকা। নোটগুলো গুণে তুলে রাখো মা—

অরু। কে দিল টাকা ?

মহেশ্বর। সাবধান করে তুলে রাখো। চিঠি এসেছে রায় সাহেব তেইশে তারিখে নিজে আসছেন।

অরু। হলধর, ঐ তোমার সেই নীলমণি সাঁপুই ?

নীল। নমস্কার কর্তামশাই। তা হলে বাঁধ-কাটার দিন স্থির করে আমায় খবর দেবেন।

নীলমণি চলে গেল।

অরু। অন্যায় হল, বাবা। ঘোষ চৌধুরীদের সর্বস্ব খোয়াচ্ছ ঐ ক'টা টাকার লোভে।

হল। খোয়া যাচ্ছিল বটে খুকিদিদি, ঐ বন্দেমাতরম্-ওয়ালাদের ঠেলায়। কিন্তু সব বজায় রইল।

অরু। রইল জমাজমি বিষয়-আশয়, খোয়া গেল তিন পুরুষ ধরে গড়ে-তোলা শ্রদ্ধা-সম্মান জমিদারের উঁচু আসন···তুমি দেখতে পাচ্ছ না বাবা, ঘুষ খেয়ে হলধর তোমার চোখে ঠলি পরিয়ে দিয়েছে।

হল। আমি ঘুষ খাই ? ছি-ছি-ছি—

অরু। তা ঠিক! ভদ্রলোকে কি ঘুষ খায় ? গালি খায়, কান-মলাটা আসটা খায়, আর পান খায়। পান খাবার দরুন কত দিয়েছে তোমার নীলমণি ?

হল। ছি-ছি-ছি—

কান্ত। কর্মকার-বাড়ি। কাস্তেটার ধার পড়ে গেল। সাতটা কিষাণ নিয়েছি। কিরে করে বেরিয়েছি, ধান কাটা আজকের মধ্যে শুথম করব।

রহিম। কাটবার মতো হয়েছে সব?

কান্ত। তবু কেটে ঝেড়ে তুলতে হবে। কর্তার মেয়ের বিয়ে। ডিক্রিজারির ভয় দেখাচ্ছে। …বাঃ রে, বাহাদুর লোক তুমি রহিম মিঞা!

রহিম। কেন?

কান্ত। পেরথোম অঘ্রানে ঘর ছাওয়া সারা করে ফেললে।

রহিম। গেল-বছর চালে যে একটা আঁটিও খড় দিতে পারি নি। ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, এক রকম সে ছিলাম ভালো। বর্ষায় বড্ড বিপাক গেছে, দাদা। বৃষ্টি এলে কাঁথা-মাদুর মুড়ি দিতাম, আর ঐ যে ভিটেবাড়ির মনিব আমার—তেতলার ঘরে আরামকুর্শিতে বসে চেয়ে চেয়ে দেখত। না, না—ভুল কথা বললাম, চোখে ও দেখতে পায় না, ও কাণা। নইলে মানুষ হয়ে মানুষের দুঃখে কি অমন চুপচাপ থাকতে পারে? মেয়েটার বরং দরদ আছে।

কান্ত। দিদি ঠাকরুণ? যার বিয়ের কথা হচ্ছে?

রহিম। হ্যাঁ। একদিন দুটো ছেঁড়া-পাটি নিজে হাতে করে এনে উপস্থিত। বলে, এই দুটো চালের উপর চাপা দিয়ে দাও। আমি অবশ্য নিলাম না। কেন নিতে যাব? কিন্তু মনটা বোঝা গেল।

কান্ত। খড় বাপের কাছে না চেয়ে যদি মেয়ের কাছে চাইতে! ভুল করেছ—

রহিম। ভুলই করেছি, দাদা। ওদের কাছে না গিয়ে যদি দারোগা

সাহেবের কাছে যেতাম! সেই সেই যেতে হল—আগে গেলে সারা বর্ষাটা নাকানি-চোবানি খেতে হত না।

কান্ত। এ খড় দারোগা দিলেন ?

রহিম। খড় নয়, টাকা। যখন যা আটকাচ্ছে—একটিবার শুধু থানায় গিয়ে দাঁড়ালেই হল।

আমিনা। বেঁচে গেলাম তাঁর দৌলতে। আমি তাঁকে ধর্মবাপ বলেছি।

কান্ত। দারোগার এত দয়া ?

রহিম। মোছলমান যে! মোছলমানের দরদ মোছলমানের উপর, হিন্দুর দরদ হিন্দুর উপর। এ তো জানা কথা।

কান্ত। কথায় কথায় তুমি আজকাল বড্ড জাত তোল, রহিম মিঞা—

রহিম। জাত আছে, তাই তুলি। তোমরা পূজো কর পূবমুখো হয়ে, আমরা নামাজ করি পশ্চিমমুখে। কলাপাতায় তোমরা যেদিকে ভাত খাও, আমরা খাই তার উল্টো দিকে। মরবার পর আমরা সেঁদোই মাটির নিচে, আর তোমাদের পুড়িয়ে ফেলে ধোঁয়া উড়িয়ে দেয় আকাশে। একেবারে দুটো আলাদা জাত। কিচ্ছু মিল নেই—

কান্ত। এ-ও বোধ হচ্ছে দারোগা সাহেবেরই কথা—

রহিম। কিন্তু খাঁটি কথা।

কান্ত। আজকালই শুনতে পাই এ সমস্ত। তোমার নানা এনায়েতউল্লা আর আমার ঠাকুরদাদা ছিচরণ মোড়ল—দু-জনে এসেছিল এই আবাদে পত্তন করতে। তারা সমস্ত দিন একসঙ্গে জঙ্গল কাটত, একসঙ্গে মাটি কোপাত। রাত্তির হলে গাছের ডালে মাচার উপর

দু-জনে গলাগলি বসে টিন পিটিয়ে পিটিয়ে বাঘ তাড়াত। তখন জাত-বেজাত ছিল না।

রহিম। ছিল দাদা, তখনও ছিল বই কি! ...ইনামের সময় আমরা পেলাম ঝুড়িখানেক মিষ্টিকথা—স্রেফ মিষ্টিকথা, আর কিছু নয়। আর তোমাদের দিয়ে দিল পঞ্চাশ বিঘের ঘেরি একেবারে বিনি পয়সায়—

কান্ত। পয়সা না দিক আমার ঠাকুরদাদা জলজ্যান্ত প্রাণটা দিয়েছিল বাঘের মুখে।

আমিনা। বাঘে খেয়েছিল?

কান্ত। খেয়ে ফেলার ফুরসৎ পায়নি। ভর দুপুরবেলা—পাশ-আঁ'লের চাষারা হৈ হৈ করে ছুটে এল। বাঘ লাস ফেলে পালাল। ধান-ক্ষেতের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইল দাদু আমার।...সে সব কি মনে করে ঘোষকর্তা? পঞ্চাশ বিঘে কমতে কমতে আজ বিশ বিঘেয় এসে ঠেকেছে। মোটে খাজনা দেবার কথা নয়, এখন বিঘে প্রতি পাঁচ পাঁচ টাকা হিসাবে।...ও কি, ঢোল বাজাচ্ছে কেন? এমন সময় ঢোল বাজে কোথায়?

আমিনা। বিয়ে করে বর ফিরে যাচ্ছে, বোধ হয়—

রহিম মই বেয়ে চালে উঠল।

রহিম। উঁহু, বর নয়। বিস্তর চাষা জমায়েত হয়েছে। হলধর গোমস্তা। হুঁ, হলধরই তো মাঝখানে। আমাদের এদিকেই আসছে।

চতুর্থ দৃশ্য

রাস্তা

কাড়ানার ঢোল বাজাচ্ছে। প্রজারা হলধরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

হল। বিয়ের ঢোল-কাঁসি নয় রে বাপু, ঢোল-সহরৎ। ভূঁয়ে কেউ আর লাঙল দিও না। ধান কাটতে ছিটেহাঁটা যদি বাকি থাকে, চটপট সেরে নাও।

অমূল্য। কেন? কেন?

কান্তরাম ও রহিম বেরিয়ে এল। ঘরের কানাচে বেড়া ঠেলে দিয়ে এসে দাঁড়াল আমিনা।

হল। নীলমণি সাঁপুইমশায়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। আর ধান হবে না, মাছ জন্মাবে। গাঙের নোনা এসে বড় হবে এই সব জায়গায়।

অমূল্য। আমরা কোথায় যাবো গোমস্তামশাই?

হল। কেন, যাও বন্দেমাতরম্-ওয়ালা বাবুদের কাছে। যোল হাত ছাতির বাঁট দেখাচ্ছে যারা। যারা জেটি বাঁধতে বলে। ...কর্তামশাই তাই বিরক্ত হয়ে বললেন, দূত্তোর—এ হাঙ্গামে কাজটা কি? ডাকো সাঁপুইমশায়কে—

কান্ত। তা তো ঠিক! তোরাই বৈঠক করে করে সর্বনাশটা ঘটালি। শনি-মঙ্গলবারের মড়া—একলা যায় না, গাঁ-সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে যায়।...আমরা ও-দলে নই, গোমস্তামশায়। আমাদের বাঁচাতে হবে—ওদের কর্মদোষে আমরা কেন মরব?

রহিম। ভিটেটার উপর অনেক দিনের নজর। এবারে আচ্ছা মতলব ঠাউরেছ। বলিহারি!

হল। এই দেখ···সব তুমি নিজের গায়ে টেনে নাও, মিঞা। আমরা কাউকে উঠতে বলব না। ভিটে উচ্ছেদ করে কে বাপু শাপ-মন্যি কুড়োবে? কর্তামশাই ধর্মভীরু লোক—পই-পই করে বললেন, দেখো, মুখ শুকনো করে কেউ না যায়—

রহিম। কিন্তু থাকব কি করে? নোনা জলে ঘরের মাটি খসে খসে পড়বে, ধানক্ষেতের উপর দিয়ে খটাখট মেছোডিঙি বেয়ে চলবে, পুকুরের জল নোনতা বিষের মতো কটু হয়ে যাবে—

হল। অবিশ্যি থাকা মুশকিল হবে। হুঁ, যেতে হবে নির্ঘাৎ। কিন্তু আমরা কিছু বলব না। ভালোমন্দ কিছু আমরা বলতে যাচ্ছি নে—

রহিম। আজকেই আমি নতুন ছাউনি শেষ করলাম—

হল। সে বিবেচনাও হবে মিঞা, কোন চিন্তা নেই। কর্তামশায়ের আট দিকে আটটা চোখ। নিজে থেকেই ক্ষতিপূরণের কথা তুললেন। ঘর পিছু—পুরানো হলে দশ, নতুন হলে পঞ্চাশ। নগদ টাকা বাজিয়ে গাঁটে গুঁজে হাসতে হাসতে সব চলে যেও। কিন্তু গণ্ডগোল করেছ কি দল পাকিয়েছ—তা হলে তাইরে নাইরে না।

রহিম। ফিকির করে যারা পথে বের করে দিচ্ছে, হাত পেতে তাদের কাছে থেকে ভিটের দাম নিতে যাব?

হল। জোর জবরদস্তি নেই মিঞা। যার যে রকম খুশি। রাজ-ঘরণী সুয়োরাণী, আর মানীর বেটা মহামানী—তারা নেবে কেন? যাদের পেটে ক্ষিধে, তারা এসে হাত পাতবে, সোনামুখ করে নিয়ে বাপের ঠাকুর বলতে বলতে চলে যাবে। ...মোটের উপর, ঐ যা বলে গেলাম—ক্ষেতে কেউ লাঙল দিও না। বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

হলধর ও অন্যান্য সকলে চলে গেল। রহিম ক্রুদ্ধ চোখে ওদের দিকে চেয়ে আছে। আমিনা এগিয়ে এল।

আমিনা। যাবো না আমরা, কিছুতেই যাবো না। খোকার কবর রয়েছে ঐ উঠোনের ধারে। দিনরাত আমি চোখে চোখে রাখি। ভিটে ছেড়ে খোকাকে ছেড়ে আমি যাবো না, যাবো না, যাবো না—

রহিম। নোনা জলের ঢেউ এসে লাগবে খোকার কবরে. ভাসা-বাদার সাপ এসে কিলবিল করবে ওর উপর।···আমরা না গেলে যে ঘোষকর্তার সদর-কাছারি বসানোর অসুবিধে হচ্ছে। ওদের অনেক দিনের আশা—

আমিনা। নোনা জল কি শুধু গরিবের বাড়িই ভাঙে? ওদের বাড়িতে তুফান উঠবে না?

রহিম। না। ইট-পাথরে গাঁথা ওদের বাড়ি। মাটি উঁচু করে চারিদিকে পাহাড় তৈরি করেছে। ঢেউয়ের সাধ্য নেই, তা ভেঙে ফেলে।

আমিনা। ভাঙবে। ভেঙে যাবে। ঢেউয়ে না হোক, আমাদের 'আড়াই শ' ঘর গৃহস্থের আক্রোশে ভেঙে পড়বে ওরা। দুঃখে ঘৃণায় আমরা অভিশাপ দিতে দিতে যাবো···দেখো তুমি, এই আমি বলে রাখছি—গাঙের শেওলার মতো ঘোষকর্তারা দলসুদ্ধ ভেসে যাবে।



পঞ্চম দৃশ্য   থানা

হল ধর ও সেকেণ্ড-অফিসার রমেন।

হল। অন্যায়, বিষম অন্যায়, ভয়ঙ্কর অন্যায় করছি আমরা বাঁধ কেটে। সব চাষার মুখে ঐ এক কথা। যেন ফেউ লেগেছে, মশায়।

রমেন। বাঘের পিছনে ফেউ লেগেই থাকে। বাঘ রুখে দাঁড়ালে ফেউরা দৌড় দেয়।

হল। তা কর্তামশায় রুখে দাঁড়িয়েছেন এবার। বললেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাঁধ কাটাবেন। আপনাদের থাকতে হবে, যাতে হাঙ্গাম-হুজ্জুত না হয়। দারোগা সাহেবকে দেখছিনে—তিনি কোথায়?

রমেন। আসছেন, এক্ষুনি বেরুবেন। কেশবপুরে গহর আলি ব্যাপারির বাড়ি ডাকাতি হয়েছে। তাই নিয়ে আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড়!

হল। (এদিক-ওদিক তাকিয়ে) চুপি-চুপি একটা কথা বলি। আপনি বলেই বলছি। আচ্ছা, গদিটা গহর আলির না হয়ে যদি তুলসী-রামের হত, দারোগা সাহেব কি ছুটোছুটি করতেন এই রকম?… যাই বলুন, জাতভাইয়ের উপর ওঁর বড্ড বেশি দরদ।

রমেন। আপনারাও তো ভাই-ব্রাদার মশায়—

হল। হাসি-মস্করা নয়, ভাবনার কথা। …ধরুন, এই ব্যাপারে মোছলমান চাষারাও এসে ধরে পড়বে। দারোগা সাহেব কি করে বসেন, ঠিক কি?

রমেন। কিচ্ছু ভাবনা নেই। আরও বড় সম্বন্ধ আপনাদের সঙ্গে। আমরা যদি হই সরকারের পুষ্যিপুত্তুর, আপনারা জমিদার-গোষ্ঠি হলেন

ঔরসপুত্তুর—ইতিহাস খুলে দেখুনগে। এই যে স্তর, হলধর শিকদার মশায় এসেছেন।

থানার ও. সি. আমিরুল হক প্রবেশ করলেন।

আমিরুল। মহেশ্বরবাবুর সঙ্গে তো দেখা হয়েছে। তাঁকে বলে দিয়েছি, আমি যাব।···রওনা হচ্ছি রমেন, ফিরতে দেরি হবে।

হেড-কনেষ্টবল মওলাবক্স প্রবেশ করল।

মওলা। ওদিকে আর দু-নম্বর বাইরে বসে রয়েছে।

আমিরুল। এখন হবে না। যেতে বলে দাও। বেরুচ্ছি।

মওলা। বলেছিলাম। তবু বসে আছে। আবার হুমকি ছাড়ে, সাহেবের কাছে আমাদের নাম করে দেখোগে—

আমিরুল। বটে! কোন্ লাটসাহেবের বাচ্চা?

মওলা। লাটসাহেবের নয়, হুজুরেরই—

রমেন। কি রকম?

মওলা। ধর্মোমেয়ে। ঐ যে···রহিম মিঞার বউটা—

রমেন। পিতৃদর্শনে এসেছে, স্তর—

মওলা। জামাইও আছেন সঙ্গে—

রমেন। আজকাল স্তরের পয় খুব ভাল যাচ্ছে। উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম—যে দিকে পা দেন, সব বেটা ধর্মবাপ বলে বসে।

আমিরুল। সাধে কি বাবা বলে? গুতোর চোটে। কিন্তু অতিষ্ঠ করে তুলল যে! দৈনিক এ রকম ডজন ডজন ধর্মছেলেমেয়ে হানা দিলে কাজকর্ম করি কখন?···ইয়ে হয়েছে। মওলাবক্স, রহিম মিঞার সেই স্টেটমেণ্টটা নিয়ে এসো তো। ও-ঘরে খাতা চাপা দেওয়া রয়েছে।

আমিরুল চেয়ারে বসে খানকয়েক কাগজ বের করলেন।

রমেন। একটা নিয়ম করে দিন স্তর, শুধু মুখের কথায় ধর্মবাবা

বলা মঞ্জুর হবে না। নতুন ধুতিচাদর দিতে হবে, তার উপর ষোড়শোপচারে ধামা ভরতি সিধে। তাহলে এই দরের বাজারে ভিড় কমে যাবে দেখবেন।

মণ্ডলাবক্স কাগজ নিয়ে এল।

আমিনুল। যাও, ডেকে নিয়ে এসো ওদের। এটায় সই হয় নি, সই করিয়ে নিতে হবে। [মণ্ডলাবক্স চলে গেল] ···আপনাকে তো বলে দিইছি। নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান।

হল। নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু যাই কি করে?

রমেন। কেন?

হল। রহিম মিঞা আসছে যে ঐদিক দিয়ে। বেটা বড্ড গোঁয়ার। থানায় এসেছি দেখলে ক্ষেপে যাবে। এমনই শাসিয়ে বেড়াচ্ছে, বাম-দা দিয়ে আমার মাথাটা কচ করে কেটে নেবে।

রমেন। কেন?

হল। ওরা বলে, কর্তামশাইকে বুদ্ধি দিয়ে আমিই নাকি এই সব খেলা খেলাচ্ছি।

রমেন। এত বুদ্ধি যে মাথায়, সেটা কেটে নেবারই জিনিষ।··· তাহলে এই দরজা দিয়ে যান। নারকেল-বাগানের মাঝখান দিয়ে বেরুনগে, কেউ দেখতে পাবে না।

হল। আপনি সঙ্গে আসুন মশায়। এই রাস্তাটুকু পার করে দেবেন। আসুন, আসুন—

হলধর রমেনের হাত ধরল। দুজনে চলে গেল। রহিম ও আমিনা প্রবেশ করল।

আমিনুল। বড্ড ব্যস্ত। বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমরা এলে তো বসতে পারি নে। কি চাই বলো? টাকা?

আমিনা। না বাবা, টাকা নয়। টাকা তো আপনি অনেক দিয়েছেন।

আমিনুল। রহিম মিঞা, গহর আলির গদি লুঠ হয়েছে—তুমি কিন্তু তার প্রধান সাক্ষী—

রহিম। ডাকাতেরা লাঠি মেরেছিল, কাঁধে এখনো এই কালসিটে পড়ে আছে।

আমিনুল। ছ-বেটাকে ধরে চালান দিয়েছি। সব শালা হিন্দু। তোমার সেই জবানবন্দিটা লিখে রেখেছি। সই করে দাও...দেখতে হবে না, ঠিক আছে। গহর মোছলমান বলেই না হিন্দুরা যোগাড়-যন্তোর করে তার সর্বনাশ করেছে!...চোখ বুজে সই করো। আমি এত করছি জাত-ভাইয়ের জন্য, তোমরা কিছু করবে না?

রহিম সই করে দিল।

রহিম। আবার এক গণ্ডগোল, সাহেব। ঘোষকর্তা নতুন ফিকির খাটিয়েছে। আবাদ ভাসিয়ে দিচ্ছে। ভিটে ছেড়ে যেতে হবে।

আমিনুল। ভিটের দশগুণ খেসারত আদায় করে দেব। ভাবনা কি? আমার নাম আমিনুল হক—হক-কথা ছাড়া বলি নে। ওরা ভিন্-জাত—কেন রেহাত করব? বুকে বাঁশ চেপে টাকা আদায় করে দেব। ফাঁকতালে বেশ কিছু পাইয়ে দেব তোমাকে। তাতে আমারই লাভ, আমারই তৃপ্তি।.. চুপ করে রইলে রহিম?

রহিম। আজ্ঞে—

আমিনা। ভিটে ছাড়তে বোলো না, বাবা—

আমিনুল। কেন, কি মধু আছে ঐ ভিটেটায় বলো তো?

রহিম। আমার নানা কোদালি ধরে গেঁথেছিল ঐ ভিটে—

আমিনা। ভিটে ছাড়তে কলজে ছিঁড়ে যাবে, বাবা। উঠোনের

ধারে রয়েছে খোকার কবর। দু-বছর আমি খোকাকে আগলে রয়েছি।

রমেন প্রবেশ করল।

আমিনুল। শোন, পাঁচ ওক্ত নামাজ করি—আমার কাছে ইসলামের চেয়ে বড় কিছু নেই। আমি বলছি, হিন্দুর আনাচে কানাচে ঐভাবে তাবেদার হয়ে পড়ে থাকা আমাদের জাতের অপমান। আমি যদি দুটো বছর থেকে যাই এই থানায়, সমস্ত মোছলমানকে একটা পাড়ায় আলাদা করে এনে বসাব। সেখানে তারাই হবে সর্বেসর্বা। হিন্দুর কোন ছোঁয়াচ থাকবে না তার মধ্যে। ...আচ্ছা, তোমরা বিবেচনা করতে লাগো, তাড়া নেই তো! আমি চলি, আমার দেরি হয়ে গেছে।

আমিনুল চলে গেলেন।

রহিম। ভিটে ছাড়ব—তিন পুরুষের ভিটে?

আমিনা। আমার খোকাকে আমি ছেড়ে যেতে পারব না—

রহিম। আপনি কি বলেন, ছোট-দারোগাবাবু? ভিটে ছাড়ব?

রমেন। আলবৎ ছাড়বে। তোমাদের বাবা বলছেন। অধর্মের বাবা নয়—খাঁটি ধর্মবাবা।...আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়। এই নরক-কুণ্ডে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল—

মা এলেন। রহিম ও আমিনা একপাশে সরে দাঁড়াল।

মা। শুনলাম, শশাঙ্কের বাড়াবাড়ি অসুখ। তাই ছুটে এসেছি। তোমরা নাকি সদর থেকে কাল ফিরেছ—

রমেন। হ্যাঁ। কিন্তু জেলখানার খবর তো কিছু জানিনে।

মা। ও—

মা গমনোদ্যত।

রমেন। একটুখানি বসুন। দারোগাসাহেব হয়তো জানেন। তিনি এই বেরিয়ে গেলেন। আমি ছুটে গিয়ে ধরছি। আপনি ভাল হয়ে বসুন...বড্ড ধুলো—বড্ড ময়লা এখানে। আপনি এইটের উপর বসুন।

গায়ের চাদরটা পেতে দিয়ে রমেন দৌড়ল। এতক্ষণে রহিম ও আমিনার দিকে মায়ের নজর পড়ল।

মা। কে? রহিম?

রহিম। হ্যাঁ মা—

মা। কতকাল পরে দেখা পেলাম আমার রহিমের।...এ কি চাঁদ-সূর্য দু'টিতে একসঙ্গে আলো করে দাঁড়িয়েছ—

মা আমিনাকে জড়িয়ে ধরলেন।

রহিম। ও কি! ও কি করলে, মা?

মা অপ্রতিভ হয়ে আমিনাকে ছেড়ে দিলেন।

মা। কি বলছিস রহিম, এতো আমার মা-লক্ষ্মী?

রহিম। হ্যাঁ, মা।...জানো তো আমাদের ঘরের বউরা বড় একটা বেরোয় না। দারোগাসাহেব হলেন নেহাৎ একেবারে আপনার লোক—

মা। তবে তুই হাঁ-হাঁ করে উঠলি কেন? আমার মাকে একটু আদর করছিলাম, হিংসে হচ্ছিল বুঝি? চিরকালের হিংসুটে তুই। দেখ্ দিকি, কি রকম জড়সড় হয়ে গেছে।

রহিম। মাগো, আমরা হলাম মোছলমান--তুমি হিন্দু, বিধবা মানুষ—এই অবেলায় ছোঁয়াছুঁয়ি হলে—

মা। ওঃ, রহিমের আমার বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, এ খবর তো জানতাম না রে!...হ্যাঁরে, হিন্দু-মোছলমান তোরা কবে থেকে হ'লি? তুই আর শশাঙ্ক পাঠশালা থেকে কালি-ঝুলি মেখে আসতিস, মুড়ির

মোয়া কাড়াকাড়ি করে খেতিস, তখন তো এসব ছিল না। ...মনে পড়ে, নারকেল গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে এলি, তার উপর আচ্ছা করে কান টেনে দিলাম। এখন হলে বোধ হয় বলতিস, দেখ—মোছলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচার।

রহিম। (হেসে) খুব মনে পড়ে মা, কান টেনে দিয়ে তারপর কোলের মধ্যে শুইয়ে সমস্ত দুপুরবেলাটা হাঁটুতে তেল মালিশ করলে। কম অত্যাচার! সে সব অত্যাচার যদি বজায় থাকত, এজাত-ওজাত হয়ে আমরা কি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারতাম এমন করে?

মা। তোর শশাঙ্ক ভাই—জেলের অন্ধকারে তিলে তিলে মৃত্যু তার দিকে এগিয়ে চলেছে—জীবনভোর সে এত দুঃখ পেয়ে গেল, সে কি মোছলমানকে বাদ দিয়ে কেবল হিন্দুজাতের জন্য?

রহিম। না মা, না। শশাঙ্ক ভাইয়ের অতি-বড় শত্রুও তা বলতে পারবে না। যে মাটির জন্য সে মরছে, সে হিন্দুর মাটি—মোছলমানেরও মাটি। ওরা মাটি দেখে, জাত দেখে না। আর সকলের জাতের খবর রাখি মা, কেবল মা আর ছেলে—তোমরা দু'টি যে কোন জাতের সেইটে বলতে পারব না।

মা। (হেসে) সকলের খবর রাখিস? বল দিকি, তোদের ঘোষ-কর্তা মহেশ্বর চৌধুরী কোন জাতের?

রহিম। হিন্দু—গোঁড়া হিন্দু—

মা। হল না রহিম। তুই বোকা ছেলে, কিচ্ছু জানিস নে, শুধু পরের শেখানো কথা আউড়ে বেড়াস। এই যে প্রজাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে, ঘোষকর্তা হিন্দু হলে হিন্দু-প্রজাদের কি কিছু দয়া করত না? হিন্দু-মুসলমান এসব কিছু নয়—ওরা জাতে হল বড়লোক, জমিদার। সে-ই ওদের আসল পরিচয়।

রহিম। আমরা চলে যাচ্ছি, সে খবর তা হলে শুনেছ তুমি মা?

মা। চলে যাচ্ছিস—শুনি নি তো। যেতে বলেছে তাই জানি। চলে যাবি কেন?

রহিম। না যেয়ে উপায় নেই। আপনার লোক বলে দারোগা সাহেবকে এসে ধরলাম, তিনি যেন কেমন-কেমন বলছেন।

মা। তোর হকের জমি, বাড়ি-ঘর-দোর গাড়ি-নৌকো এসব ছেড়ে চলে গেলে মহাপাপ হবে রহিম—

রহিম। মহাপাপ হবে ঘোষকর্তার—অন্যায় করে যে আমাদের তাড়াচ্ছে।

মা। অন্যায় করাটাই শুধু পাপ নয় রহিম। অন্যায় যে ঘাড় পেতে নেয়, সে-ও সমান পাপী।

রহিম। এ তুমি কি বলছ মা? আমার বুকের ভিতরের কথাটা তুমি যে টেনে এনে বলে দিলে।

আমিনা। দারোগা সাহেবের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ,—তিনি ধর্মবাপ, কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধ মা তোমার সঙ্গে—

রহিম। শুনছি মা, কোটালের মুখে ঘোষকর্তা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গেটের মুখ কাটিয়ে দেবেন।

মা। তোরা কি করবি তখন? প্রাণ ভরে ঘোষ-ঠাকুরপোকে গাল দিবি, আর খোদার নামে মানত করে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকবি তো? বল—বল্—

আমিনা ও রহিম মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল।

মা। ওঠ্—মাথা উঁচু করে বাড়ি চলে যা। তোর হকের ভিটে হকের ঘর-বাড়ি—

আমিনুল ও রমেন প্রবেশ করলেন।

আমিনুল। এই যে, এখনো আছ তোমরা? কি বিবেচনা করলে শেষ পর্যন্ত? আমি যা বললাম, তার একটা জবাব চাই—

রহিম। সালাম দারোগা সাহেব, আলেকুম সালাম। বাড়ি যাচ্ছি—

আমিনুল। জবাব?

আমিনা। সালাম —

রহিম ও আমিনা চলে গেল।

আমিনুল। বেশ, শুনে রাখলাম তোমাদের জবাব। বেশ।... আপনি এসে বসে আছেন শুনে ফিরে এলাম। শশাঙ্ক বাবুর শরীর খারাপ বটে, কিন্তু ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমি কাল-পরশুর মধ্যে সমস্ত খবর আনিয়ে দিচ্ছি। ডাক্তারের রিপোর্টও পাবেন।

মা। আচ্ছা, নমস্কার—

মা চলে গেলেন।

আমিনুল। বড্ড যে খাতির দেখছি রমেন। মা-টিকে আলোয়ান পেতে বসিয়েছ—ছেলে ওদিকে জেলে পচে মরছে।

রমেন। তিনি রাজবন্দী স্যর, অর্থাৎ বন্দীর মধ্যে রাজা। তাই মাকে যথাশক্তি রাজমাতার মান্য দিলাম।

আমিনুল। বলি, ব্যাপারটা কি?

রমেন। কিচ্ছু বলা যায় না। হয়তো দেখবো, ঐ শশাঙ্কবাবুই একদিন য়্যুনাইটেড স্টেটস্ অব ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্ট হয়ে এসেছেন। আগে থাকতে একটু খাতির জমিয়ে রাখলাম। হ্যাঁ স্যর, ইতিহাসে নজির আছে। ফাঁসির আসামিও শেষ পর্যন্ত—

আমিনুল। ইতিহাসই মাথা খেয়েছে তোমার—

রমেন। আগে তো জানতাম না স্যর, এমন সোনার চাকরি পেয়ে যাব। তা হলে খেটেখুটে পড়াশুনো করত কোন্ বেকুব? ...ভাবনা নেই—এ সব সেরে যাবে, আর দু-এক বছরের মধ্যে সমস্ত পড়াশুনো বেমালুম হজম হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাঁধ ও লকগেট

অনতিদূরে ঘোষ চৌধুরীদের বাড়ি। মহেশ্বর নিজে দাঁড়িয়ে বাঁধ কাটানর ব্যবস্থা করছেন। নীলমণি সাঁপুই, হলধর, বিশে বরকন্দাজ, কোদালিরা ও অনেকগুলি প্রজা।

অমূল্য। দরবারটা শুনুন কর্তামশাই, আমাদের দরবার—

আকবর আলি। এ কি সত্যি যে, বাঁধ আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাটাবেন?

মহেশ্বর জবাব দিলেন না।

আকবর। জোয়ারের জলে প্রজাদের চাষ নষ্ট হত বলে আপনার পিতা সৃষ্টিধর ঘোষ চৌধুরী একদিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই বাঁধ বেঁধে দিয়েছিলেন—

মহেশ্বর। আমার পিতা অনেক কিছু করেছিলেন। এই পাকা রাস্তা তাঁর টাকায় তৈরি। অতিথিশালা ডাক্তারখানা আর মাইনর ইস্কুলও তাঁর আমলের—

অমূল্য। তাই আড়াই শ ঘর প্রজা—গাছে প্রথম ফল ধরলে, নতুন গাই বিয়োলে কেউ আমরা ঠাকুর-দেবতাকে দিতাম না, বাবুকে প্রণাম করে পায়ের কাছে রেখে যেতাম। যেদিন তিনি মারা গেলেন, গাঁয়ের আড়াই শ গৃহস্থের কারো ঘরে সেদিন রান্না হয় নি—

মহেশ্বর। আর এখন? ...কে মনে রেখেছে বলো তো সেসব কথা?

হল। হুঁ, মনে রাখবে। নেমকহারাম বেটারা। চার-পো কলি—ভক্তিশ্রদ্ধা কিছু আর নেই। খাজনার উপর সিকি পয়সা পার্বণী

চড়ালে যারা নতুন আইনের দোহাই পাড়ে, তারা দেবে গাছের ফল— গোরুর দুধ! হয়েছে আর কি!

আকবর। ও হল আয়নায় মুখ দেখা কর্তামশাই। হাসতে লাগুন, হাসি দেখতে পাবেন। আবার মুখ ভেঙচান, আয়নাও তেমনি ভেঙচে উঠবে। ...আপনার আমলে আগেকার সবই তো উঠে গেছে। ওদিকে গেছে, তাই এদিকেও গেছে।

মহেশ্বর। আকবর আলি, দু-পাতা ইংরাজি পড়ে লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ছ। কিন্তু মনে রেখো, জমিদার জমিদারই—দোকানদার নয়। আমার যতটুকু খুশি হবে দেবো—যতখানি প্রয়োজন হবে আদায় করে নেবো—

মা এলেন।

মহেশ্বর। এই যে রায়গিন্নি—আপনি চলে এলেন এতদূরে? আবাদ ভাসালে আপনার তো কানাকড়ির ক্ষতি নেই। আপনি এর মধ্যে কেন? আমার মাতুলগুষ্টির মেয়ে আপনি, অন্য আত্মীয়তাও রয়েছে। এদের মধ্যে আপনাকে দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছে—

মা। করব কি, আড়াই শ ঘর চাষী উৎখাত হয়ে যাচ্ছে। আত্মীয় বলেই তো লজ্জা ত্যাগ করে এলাম তোমার কাছে। কথা রাখো ঠাকুরপো, এ মতলব ছেড়ে দাও—

মহেশ্বর। আমি খবর রাখি রায়গিন্নি, কার আস্কারা পেয়ে ঐ হাঘরেগুলো কোমর বেঁধেছে। আমার কন্যাদায়। প্রজা যে, ছেলেও সে। হাজার দশেক টাকার দরকার আমার; দশটি পয়সাও সাহায্য উঠল না।

হল। বলো, দশজন তোমরাই বলো, ঘেন্না আসে কি না? তাই হুজুর বললেন, আমায় দেখল না—আমিই বা ওদের দেখব কেন?

…আর এই সাঁপুই মশায়—কথাটা কানে গেছে কি না গেছে—রোক টাকা অমনি গুণে দিয়ে যাচ্ছেন।

মহেশ্বর। অরুর বিয়ের টাকার দরকার। টাকা আমি চাই-ই।

অমূল্য। কিন্তু কর্তামশাই, আপনি কি শুধু নিজেরটাই দেখবেন?

হল। কেন, শুধু নিজেরটা দেখবেন কেন? এই নীলমণিও লাল হয়ে যাবেন, বলে দিচ্ছি। এক বছরেই মাছটা কি রকম জম্মাবে, আন্দাজ করো দিকি—

অমূল্য। আর আমরা—যারা ক্ষেতের তলানি খেয়ে বাঁচি—আমাদেরটা কে দেখবে?

হল। দেখবে বাপু, দেখাশুনোর কত মুরুব্বি জুটেছে আজকাল। নাম করে আবার কোন ফ্যাসাদে পড়ব! এখানে সেখানে সভা, লম্বা লম্বা বক্তৃতা, আজকাল তো মনিব-মহাজন লাগে না তোমাদের। ভেবেছ, ল্যাজে করে ওঁরা বৈতরণী পার করে দেবেন, পারানি লাগবে না? ডুবে মরবে, মাঝগাঙে ভরাডুবি হবে—এই তোমাদের বলে রাখছি।

মহেশ্বর। সত্যি বলছি রায়গিন্নি, আমাদের সময়েও স্বদেশিওয়ালারা ছিল, তারা সাহেবদের গালি দিত। সে ভালো—খুব চমৎকার…তারা জাত নয়, জ্ঞাত নয়, আমাদের কথাবার্তাও বোঝে না, গালি দেব নয়তো কি ছেড়ে কথা কইব? কিন্তু নিজেদের মধ্যে এই যে রেশারেশি—আমার পিছনে আপনি লাগছেন, আমার প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন—

মা। কেউ কাউকে ক্ষেপাচ্ছে না ঠাকুরপো, ও তোমাদের মিথ্যে ধারণা। যুগ পালটে গেছে…নতুন কালের নতুন হাওয়া…কাঁধে চেপে কাটানোর দিন চলে যাচ্ছে, জনগণ জেগে উঠেছে—

হল। কি বল্লেন ঠাকরুণ, কি জেগেছে!

আকবর। জনগণ—

হল। হুঁ, এই কার্তিক কামার—বাতে ভোগে, তিন দিনের কম একখানা কাস্তে গড়তে পারে না—কিম্বা এই বিলাত আলি, হাল করেছে তার দামড়া-গরু নেই, বর্ষা না পড়তে এক খুচি ধান কর্জ করবার জন্ম কর্তামশাইর বাড়ি চষে ফেলে—কিম্বা ধরুন, আমাদের কান্তরাম, তিন বছরের বকেয়ার দরুন মাথার উপর খাড়ার মতন ডিক্রি ঝুলছে—এদের আবার আজকাল নতুন নামকরণ হয়েছে, জনগণ। এরা নাকি জেগে উঠেছে, উঠে আড়ামোড়া ভাঙছে। হেসে আর বাঁচিনে বাপু—

মহেশ্বর। রায়গিন্নি, এ আবাদের নাম হাতীপোতা কেন হয়েছে জানেন বোধ হয়?

হল। পোষা হাতী বেয়াড়াপনা করেছিল বলে কর্তামশাইর ঠাকুরদাদা জলজ্যান্ত হাতীটাকে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলেন—

মহেশ্বর। এই এতগুলোর মধ্যে কোনটাই হাতী নয়—গালভরা যত বড় বড় নামই দিন না কেন—সমস্ত কুকুর-বেড়াল, ইঁদুর-আরসোলা। এদের বেয়াড়াপনা দেখে সবসুদ্ধ এবার ভাসিয়ে দিয়ে যাব বলে এসেছি। এ হাতীপোতার সমস্ত জমি আমার। সেখানে আমি ধানকর জলকর যা খুশি করব। কারো তোয়াক্কা রাখি নে। ...এই, কোদাল মার্—কেটে দে বাঁধ। কান্তরাম প্রবেশ করল।

কান্ত। আমার জমি? আমার যে কুড়ি বিঘে এখনো রয়েছে!

মহেশ্বর। কারও জমি এক কাঠাও নেই এই আবাদে।

কান্ত। আমার আছে কর্তামশাই, আমার—আমার—

মহেশ্বর। না, নেই। এই কোদালি!

কোদালি কোদাল তুলতে কান্তরাম বাঁট চেপে ধরল।

কান্ত। আছে—আছে—

হল। আছে? বেশ...চেঁচামেচির দরকারটা কি বাপু? থাকে, দলিল-দস্তাবেজ বের করো। দশজন উপস্থিত আছে, সকলের মুকবেলা আস্কারা হয়ে যাক—

কান্ত। দলিল আমার দাঁদুর রক্ত। বাঘে-খাওয়া রক্তের ধারা পড়েছিল ধানজমির উপর। আজও হয়তো তার দাগ রয়েছে।

মহেশ্বর। নেই। বন্যায় বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে সে-সমস্ত। যেমন মুছে গেছে আমার বাবার কীর্তিকাহিনী—

হল। বেটা চাষার ঢেঁকি! তোর ছেঁদোকথার দামটা কি রে বাপু? আইন আমাদের দিকে—

মা। আমি মেয়েমানুষ, আইন জানি নে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঠাকুরপো, সত্যিই কি এ অন্যায়ের প্রতিকার নেই?

মহেশ্বর। আইন স্বীকারই করছে না যে অন্যায়—

মা। যা অন্যায়, তা সর্বকালে সর্বদেশে অন্যায়। আইন যদি সমর্থন করে তো বলব, একচোখো আইন—ও আইন পালটাবার দরকার।

রহিম প্রবেশ করল।

মহেশ্বর। সে কথা ভাল। ছেলে জেল থেকে বেরুলে এবার তাকে সুবুদ্ধি দেবেন রায়গিন্নি, ভোট নিয়ে অ্যাসেম্বলিতে আইন উলটাতে চলে যাক। ততদিন আমাদের বাধা দেবেন না—

রহিম। আমরা জীবন দেব—

কান্ত। হুজুর, আমি আপনারই দলে। আমার সর্বনাশ করবেন না।

হল। ঐ রকম করে বলো চাঁদ, কর্তার মন ভিজলেও ভিজতে পারে। মেজাজ দেখিও না।

কান্ত। বুক পেতে দিচ্ছি বাঁধের উপর। আমার বুকে কোদাল মারো তোমরা।

মা। আমি হাতে ধরে বলছি ঠাকুরপো, এদের দিকে চেয়ে দেখ। তোমার মেয়ের বিয়ের দু-হাতে টাকা ছড়াতে পারবে না—তার অভাব বোধ করছ। আর এদের অভাব অন্ন-বস্ত্রের। এরা মানুষ, তুমিও মানুষ—

প্রবীর, সন্তোষ ও আমিনুল প্রবেশ করল।

সন্তোষ। না মা, মানুষ বললে ওঁকে যে অপমান করা হয়। উনি জমিদার।

হল। আর কি হুজুর, দারোগাসাহেব এসে গেছেন। কুছ পরোয়া নেই। কথা দিয়েছিলেন, ঠিক এসেছেন—

প্রবীর। প্রবল প্রতাপান্বিত মহামহিম ঘোষকর্তা বাহাদুর, বাঁধ তো কাটা গেল না।

হল। কেন? কেন?

প্রবীর। খোদ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমনামা—

মহেশ্বর। ব্যাপার কি দারোগাসাহেব?

আমিনুল। একশ চুয়াল্লিশ ধারা। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা থাকায় আপাতত বাঁধ-কাটা বন্ধ।

হলধর দারোগার খুব কাছে এল।

হল। এ কি হল দারোগাসাহেব? বন্ধুলোক হয়ে আপনি—

আমিনুল। আমার দোষ কি, আমি কি বিন্দুবিসর্গ জানতাম? উপরওয়ালার হুকুম। ...কিচ্ছু না, একটা টেমপোরারি ইনজাংসন। এমন রিপোর্ট দিয়ে দেব, বিলকুল ফাঁস হয়ে যাবে—

হল। দেবেন। তাড়াতাড়ি কিন্তু। নইলে মুখ দেখাবার জো থাকবে না—

হলধর সরে যেতে রহিম দারোগার কাছে এল।

রহিম। খুব ঠেকিয়ে দিয়েছেন। ...তলে তলে এ সব জোগাড় কে করল, আপনি?

আমিনুল। আমি, আমি। আমি ছাড়া এত মাথাব্যথা কার? সেদিন মুখ চুণ করে থানা থেকে চলে এলে। তখন থেকেই ভাবতে

লাগলাম, তাই তো কি করা যায়। একে মোছলমান, তায় ধর্মসম্বন্ধ। …ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কম হাঁটাহাঁটি করেছি? কিন্তু এর মধ্যে তুমি কেন রহিম? আবার সমিতি-টমিতি করে বেড়াচ্ছ নাকি? হিন্দুদের ঐ সব ধাপ্পার মধ্যে যদি পড়ো, আমি কিন্তু একদম সরে দাঁড়াব; কিছু হবে না আমাকে দিয়ে—

রহিম। না—না। বিপদে পড়ে আজকেই শুধু এসেছি।

আমিনুল। খবরদার, খবরদার!

মহেশ্বর। এরা দুটি…কখনো দেখিনি তো—

প্রবীর। আমরা কলকাতায় থাকি—

মা। আমার আর দুটি ছেলে। শশাঙ্ক জেলে যাবার পর সমিতির সমস্ত ভার এরা কাঁধে তুলে নিয়েছে।

হল। আহা-হা, আবার কোন্ ভাল-মানুষের দুটো নধর ছেলেকে হাঁড়িকাঠে এনে ফেলেছে গো!

অরুন্ধতী প্রবেশ করল। রহিম সসম্ভ্রমে পাশ কেটে দাঁড়াল।

অরু। কি হয়েছে বাবা? বাড়ির সামনে হট্টগোল কিসের?

মহেশ্বর। রায়গিন্নির কাছে আজ বড্ড হারা হেরে গেলাম, মা।… আজকে হল না নীলমণি, কিন্তু কথা দিচ্ছি, এক মাসের মধ্যে—

প্রবীর। পারবেন না, মিথ্যে স্তোক দেওয়া—

হল। এক মাঘে শীত যায় না। দেখাই যাক, কে পারে আর কে হারে—

প্রবীর। আমরা সভা ডাকছি আপনারই এলাকার মধ্যে—গড়-ভাঙার হাটখোলায়। খবর জানতে পারবেন। সভায় যাবার জন্য আপনাকে নিমন্ত্রণ করে রাখছি।

হল। হাটুরে সভায় যান না কর্তামশাই।

অরু। কেন আপনি গায়ে পড়ে বাবার অপমান করছেন?

প্রবীর। অপমান নয়, সুবুদ্ধি দিচ্ছিলাম—

অরু। যান, চলে যান আপনারা। রহিম!

রহিম। দিদিঠাকরুণ—

অরু। এঁদের নিয়ে যাও, ভাই। কাজ তো চুকে গেছে।

রহিম। চলুন—

সকলে চলে গেল। নীলমণিও যাচ্ছিল। অরুন্ধতী তাকে ডাকল।

অরু। দাঁড়াও নীলমণি। এই তোমার আগাম-দেওয়া টাকা। গুণে দেখে নাও। দু-হাজারই আছে পুরোপুরি—

মহেশ্বর। টাকা? টাকা ফিরিয়ে দিতে তোকে কে বলেছে? নীলমণি তো চায় নি।

নীল। কেন চাইব? সামান্য ক'টি টাকা—তার জন্য কি আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি কর্তামশাই? বেশ তো, এক মাসে না হোক—দু'মাসে ছ'মাসে যেদিন খুশি আবাদ ভাসিয়ে—

অরু। না, কোনদিন ভাসানো হবে না। হাতীপোতার ইজ্জত বেচে আমি টাকা নিতে দেব না, বাবা।

মহেশ্বর। অ্যাঁ—

অরু। ঘোষ চৌধুরীদের দয়ায় ঘরে ঘরে শ্রীসমৃদ্ধি এসেছে, শতকণ্ঠে সাধুবাদ এসেছে। আজকে আর সেদিন নেই, আমাদের দুঃসময় পড়েছে। খবর পেয়ে শকুনির মতো চারিদিক থেকে এরা এসে জুটেছে; টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তোমাকে দিয়ে ছোট কাজ করিয়ে নিতে চায়, বাবা।

নীল। এ কি বলছেন আপনি?

অরু। যাও, এ গাঁয়ের ত্রিসীমানায় তোমায় আর কোনদিন দেখতে না পাই। নিয়ে যাও তোমার টাকা—

নোটের বাণ্ডিল অরুন্ধতী তার গায়ে ছুঁড়ে মারল।

পাতালপুরী

প্রথম দৃশ্য   গড়ভাঙার হাটখোলায় সভা

সভানেত্রী হয়েছেন মা। প্রেক্ষাগৃহের দর্শকরাই শ্রোতা।

আকবর। চুপ করুন। গোল করবেন না। শশাঙ্ক-ভাইয়ের সম্বন্ধে বড় উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে এই সুযোগে জমিদার আবাদ ভাসানোর চেষ্টা করছে। এই সমস্ত আলোচনা হবে আজকের সভায়। চুপ করুন, আপনারা সব চুপ করুন। মা এইবার আপনাদের দু-এক কথা বলবেন।

মা। (উঠে দাঁড়ালেন) পাড়াগেঁয়ে সামান্য স্ত্রীলোক আমি, সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব না, বাবা। তোমরা অনেকেই আমাকে মা বলে ডাক—আমার গুণে নয়, তোমাদেরই গুণে। শশাঙ্ককে তোমরা সকলে ভালবাস। আমার পেটের ছেলে শশাঙ্ক—বিধবার একমাত্র সন্তান। কিন্তু সে একলা আমার নয়, তোমাদের সকলের। তোমরা সকলে তার ভাই-বোন। তোমাদের হয়ে সে যা করে, যে-সব কথা বলে জমিদারের তা ভাল লাগে না। জেলে জেলেই তার জীবন কাটল; শেষদিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। খবর পেয়ে তোমরা বিচলিত হয়ে পড়েছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কারা এর জন্য দায়ী? কারা তাকে জেলে পাঠিয়েছে?

প্রেক্ষাগৃহ থেকে। ঐ যে নতুন দারোগা এসেছে—

মা। (বজ্র কণ্ঠে) না—

প্রেক্ষাগৃহ থেকে। ঘোষকর্তা তলে তলে ঐ দারোগার সঙ্গে চক্রান্ত করে—

মা। না—না, তারা নয়, তোমরা। হ্যাঁ, তোমরাই। শিরদাঁড়া ভাঙা আড়াইশ' ঘর চাষী-গৃহস্থ—তোমাদেরই ভীরুতার প্রায়শ্চিত্ত করছে শশাঙ্ক—

প্রেক্ষাগৃহ থেকে। ঢের হয়েছে, বসো ঠাকরুণ, বসো দিকি—

সন্তোষ। কে? উঠে দাঁড়াও না কেমন মরদ। মুখখানা দেখি—

মা। আঃ, বোসো সন্তোষ। ওতে কান দিতে নেই।...হ্যাঁ, আমি বলছি, এই হাতীপোতা গ্রামের একটিমাত্র শশাঙ্ক নয়—ভারত বর্ষের গ্রামে গ্রামে এই রকম আমার কত শশাঙ্ক নিঃশব্দে জীবন দিয়ে তোমাদেরই ভীরুতার প্রায়শ্চিত্ত করছে। তোমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পার নি, অন্তর দিয়ে কোনদিন অনুভবও কর নি—এই পৃথিবীর জল আলো হাওয়া যেমন অবাধে পাও, তার মাটিতে মাটির ফসলে, তার ঐশ্বর্য্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সুখসমৃদ্ধিতে তেমনি তোমাদের সকলের সমান অধিকার। মানুষকে যারা পশু বানিয়ে রাখে, মনুষ্যত্বকে তিলে তিলে পিষে মেরে তাদের কঙ্কালের উপর আরামের অট্টালিকা গড়ে তোলে, তারা সমাজের শত্রু। শত্রুর সামনে কুঁজো হয়ে তোমরা পিঠ পেতে দিয়েছ—সে পিঠের উপর চড়ে তোমাদের ঐ ঘোষকর্তা—

প্রেক্ষাগৃহে গোলমাল, কুকুর-ডাক ইত্যাদি।

মা। (আরও উঁচু গলায়) ঘোষ-ঠাকুরপোর নাম করেই বা বলি কেন—সে আর কতটুকু জীব? এই লোলজিহ্ব সভ্যতা তার ঐশ্বর্য আরাম আর কালচারের গৌরবে উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের শশাঙ্ক-ভাই এর প্রতিবাদ করল। প্রতিবাদ উঠল আরও শত শত কণ্ঠে। তাদের দাবি, পৃথিবীর সকল জায়গায় প্রতিটি মানুষের সমৃদ্ধি, জগতের অনন্ত শান্তি। কিন্তু এত বড় দেশের তুলনায় ক'জন তারা? সমস্ত মানুষের কথা যখন একটি দু'টি লোকে বলতে যায়, গলাটা তাদের বেশি উঁচু হয়ে উঠে। শক্তিমান মনে করে, ঐ গলাটা

বন্ধ করে দিলে সকলের কথা চাপা পড়ে যাবে। সকল আক্রোশ তাই ঐ একটি-দু'টির উপর গিয়ে পড়ে।

প্রেক্ষাগৃহ থেকে। তেঁতুলতলার বৃষ্টি—থামে না যে!

সন্তোষ। মিটিং ভাঙবার জন্য কত টাকা খেয়ে এসেছ, লক্ষ্মীধন?

মা। শশাঙ্কের কণ্ঠ আজ নিস্তব্ধ। কিন্তু দেশের প্রতিটি নর-নারীকে স্তব্ধ করে রাখবে, এত বড় জোর কারও নেই। তোমাদের শশাঙ্ক-ভাইকে বাঁচাতে চাও তো তারই কথা শত কণ্ঠে তোমরা বলতে থাক, কোন অত্যাচার আমরা সইব না; হাতীপোতার সোনা ফলিয়ে এসেছি আমরা, এ জমি আমাদের। বাঁধ কাটতে দেব না।

রহিম ও শশাঙ্ক প্রবেশ করল। রহিমের মাল্লার বেশ; হাতে বৈঠা।

আকবর। কে? আরে এ কে? শশাঙ্ক—শশাঙ্ক-ভাই যে! বলো ভাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

চারিদিকে জিন্দাবাদ ধ্বনি।

রহিম। আমি ডিঙি নিয়ে ইস্টিশানে গেছলাম। এর মধ্যে খুলনার গাড়ি এল। স্বপ্নেও ভাবিনি মা, শশাঙ্ক ভাই সেই গাড়িতে। ধরে নামাতে হয় এই রকম অবস্থা। তাকে নিয়ে চলে এলাম।

আকবর। এই কি সেই শশাঙ্ক-ভাই? দেখ দেখ, চেয়ে দেখ—

মা। শশাঙ্ক নয়, তার ছায়া—

শশাঙ্ক। বেঁচে আছি, মা। আমি বেঁচে আছি, ভাই সকল। বাইরেটা এই রকম দেখছ। জেলের আঁধারে বসে বসে মনের ভিতর আমি নতুন আলো নিয়ে এসেছি।

প্রবীর। ছেড়ে দিল যে? এখনো এগারো মাস বাকি।

শশাঙ্ক। রোজ জ্বর হচ্ছে। এ শরীর আর মেরামত হয় কি না হয়—কর্তাদের সন্দেহ হল। বদনামের ভাগী হতে যাবে কেন। তাই হঠাৎ কাল সন্ধ্যায়—

মা। শরীরে যে এক ফোঁটা রক্ত নেই···একেবারে কাগজের মতো সাদা?—ওঃ, কি হল?

অকস্মাৎ ঢিল এসে শশাঙ্কের চোয়ালে লাগল। শশাঙ্ক ঘুরে পড়ল। মা তাকে বাহু আগলে ধরলেন।

আকবর। কে? কোন্ শয়তান?

সন্তোষ। পালাচ্ছে। ধরো ধরো—

রহিম ছুটল।

শশাঙ্ক। কিছু হয় নি মা, কে আমার আপনার জন অভ্যর্থনা করেছে আমাকে।

রহিম কান্তরামের চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

রহিম। এই হারামজাদা মেরেছে। এই মানুষকে ঢিল মারতে হাত কাঁপল না?

প্রেক্ষাগৃহ থেকে। ওর হাড়মাংস টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো—

আর একজন। মারো মারো—

শশাঙ্ক। থামো—থামো। কি করছ?

প্রবীর। কেন তুই এমন কাজ করলি?

আকবর। বেকায়দা লাগলে কি সর্বনাশ হয়ে যেত, বল্ তো কান্তরাম—

রহিম। আস্ত শয়তান। কথা বলে না, বোবা সেজে আছে।

কান্তরামের মেয়ে যামিনী প্রবেশ করল।

যামিনী। বাবা এখানে? বাবা, বাবা! বাবাকে তোমরা ধরেছ কেন?···হলধর গোমস্তা আর এক চাপরাশি এসে মেইকাঠে নুটিশ টাঙিয়ে দিয়ে গেল, বাবা—

রহিম। কিসের নুটিশ আবার?

শশাঙ্ক। (কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ল) তোমার উঠোনের সমস্ত ধান ঘোষকর্তারা ক্রোক করে নিয়েছে, কান্তরাম।

কান্ত। ধান ক্রোক? ওরা আমার ধান ক্রোক করল?···আমার হাড়-মাংস টুকরো টুকরো কর তোমরা। ···মারো আমায়—কিল চড় লাথি যত খুশি। তোমাদের পায়ে ধরছি, মারো—আমার মেরে ফেল—বাঁচতে আমি চাইনে—আমায় বাঁচিয়ে রেখো না—দোহাই তোমাদের—

কান্তরাম উন্মাদের মতো নিজের দু'-গাল চড়াতে লাগল।

দ্বিতীয় দৃশ্য — ঘোষকর্তার বাইরের ঘর

মহেশ্বর ও হলধর

মহেশ্বর। সংবাদ কি হলধর?

হল। দুঃসংবাদ, অতীব দুঃসংবাদ। যা বলে গিয়েছিল, ঠিক তাই। সভা বসিয়াছে।

মহেশ্বর। আজকে তেইশে। রায় সাহেব আসছেন। তার কি বন্দোবস্ত করেছ?

হল। আজ্ঞে, ডিঙি পাঠিয়েছি। এতক্ষণ স্টেশনের ঘাটে পৌঁছে গেছে। বিশে বরকন্দাজ সঙ্গে আছে।

মহেশ্বর। পাঠিয়ে দিয়েছ? বেশ। ...তারপর?

হল। সেই যে ক'টা সমন এসেছে—আমি চাপরাশির সঙ্গে সেই-গুলো জারি করে করে বেড়াচ্ছিলাম, দেখি—যত বেটা হেলো-চাষা পঙ্গপালের মতো চলেছে। বৃত্তান্ত কি? না, স্বদেশি সভা। মনে ভাবলাম হুজুর, আমি কিছু বিদেশি নই—আর দেশটা যে ওদের ইজারা মহল—তা-ও নয়। গিয়ে শুনিই না, কি বলে। পায়ে পায়ে গেলাম হাটখোলায়। মাথায় আচ্ছা করে কম্পর্টার জড়িয়ে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে খেজুরবনের দিকটায় ঘাড় গুঁজে বসে পড়লাম। তা হুজুর, সাধ্য কি যে বসে থাকি! কুলোতে পারলাম না, উঠে আসতে হল।

মহেশ্বর। মশা?

হল। আজ্ঞে না, আগুনের ফুলকি। বক্তৃতার চরকিবাজি খেলিয়ে দিচ্ছে। ঘেন্নায় মরি হুজুর। মুড়ি মিছরি একেবারে একদর হয়ে গেছে। চাষাভূষো আর ভদ্দরলোকের ছেলে এক সঙ্গে কোমর বেঁধে দেশ উদ্ধারে লেগেছে। নতুন নতুন রোগ বেরুচ্ছে না আজকাল—এই বন্দেমাতরম্ হল সেইরকম একটা।

মহেশ্বর। খাঁটি কথা বলেছ হলধর, বিষম ছোঁয়াচে রোগ। কার ঘরের ছেলেমেয়ের কখন যে মাথা ঘুলিয়ে উঠবে, কিছু বিশ্বাস নেই।

হল। কুড়িকুষ্ঠ মহাব্যাধি। বুঝলেন হুজুর? থুঃ থুঃ—নিজের মাকে কেয়ার করেন না, বাবুরা দেশ-মাকে স্বর্গে তুলে বাতি দেবেন। বলিহারি আপনাদের ঐ শশাঙ্কচন্দ্রের গর্ভধারিণীকে। ওঁর ঘেন্নাপিত্তি নেই—

মহেশ্বর। তিনি আছেন নাকি ঐ সভায়?

হল। তিনি প্রেসিডেন্ট। কলকাতার সেই কাজিল ছোঁড়াছুটোও

আছে। আমি হলপ করে বলতে পারি, রায়গিন্নিই জপিয়ে জাপিয়ে ঐ ছুটোর ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছেন। হিংসে—বুঝলেন না? নিজের ছেলে জেলে পচছে, আর দশজনে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করবে, একি সহ্য হয়? দাও, তাদেরও জেলে পাঠিয়ে দাও। মরুক ঘানি ঘুরিয়ে। তাতেই শান্তি! কলকাতা অবধি হানা দিয়ে কোন্ ভাল মানুষের ছুটো নধর ছেলেকে জুটিয়েছে। আমি কান্তরাম এব্রাহিম গাজি আর হরিচরণ গোঁসাইকে বসিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

মহেশ্বর। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) হলধর!

হল। আজ্ঞে—

মহেশ্বর। কি জন্মে বসিয়ে এসেছ তাদের?

হল। আজ্ঞে, বক্তৃতা শুনতে—

মহেশ্বর। হুঁ, বক্তৃতা শুনতে! অরুন্ধতী প্রবেশ করল।

অরু। বাবা, শশাঙ্কদাদাকে ছেড়ে দিয়েছে—

মহেশ্বর। বলিস কি?

হল। ঝুটো খবর। ···ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঠেসে দিয়েছে তু'বছর। ছেড়ে দিলেই হল?

অরু। তিনি ফিরে এসেছেন। গাঁয়ের ছেলেমেয়ে সব হাটখোলার দিকে ছুটেছে। দেখ না বারান্দায় এসে—

কান্তরাম প্রবেশ করল।

কান্ত। হ্যাঁ, এসেছে। আমি দেখে এলাম—

অরুন্ধতী ও মহেশ্বর চলে গেলেন।

কান্ত। পা দিতে না দিতেই মেরে এসেছি এই এত বড় এক ঢিল—

হল। চুপ, চুপ···আস্তে। আমি জানি, কাজের মানুষ তুই মোড়ল। কেউ দেখেনি তো?

কান্ত। এত বড় একটা কাজ—কেউ দেখবে না, সে কি হয়?··· ক্যাকাশে মুখ, দড়ির মতো শিরা ভেসে উঠেছে—ছুটো দিন শশাঙ্ক মায়ের কাছে জুড়োতে এসেছে। দিলাম ছুঁড়ে বৌ-ও করে। আমার ক্ষমতা দেখে সবাই তাজ্জব বনে গেল। চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে হাজির করল সামনে—

হল। এই দেখ। হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করতে হয়। বুড়ো হয়ে মরতে গেলি, বুদ্ধি-জ্ঞান হল না। আমরা যে এর মধ্যে আছি, সে সব কিছু বলিস নি তো?

কান্ত। তা বলি নি। দমাদম ঘুসি ঝাড়তে লাগল, হাড়-মাংস ছিঁড়ে নিতে চাচ্ছিল, একটা কথা আমি মুখ দিয়ে বের করি নি।

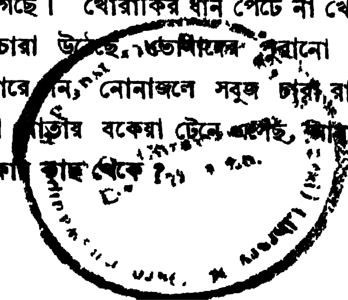
হল। ভালো, ভালো।···হুজুরকে বলে আমি তোব বথশিসের ব্যবস্থা করব কান্তরাম।

কান্ত। আবার কি বথশিস দেবে গোমস্তামশাই? এই যে দিয়েছ! বথশিস একেবারে উঠোনের উপর টাঙিয়ে রেখে এসেছ।

সে নোটিশটা দিল।

হল। কি করা যায়, বল্। মালেকের মালখাজনা—কম তো নয়, তিন-তিন বছরের বকেয়া—

কান্ত। আর আমার তিন বছরের মেহনৎ? রোদ-বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে গেছে। খোরাকির ধান পেটে না খেয়ে বীজতলায় ফেলেছি। বাড়-বাড়ন্ত চারা উঠেছে, তোমাদের পুরানো বাঁধ কোটালের তোড় সামলাতে পারে নি, নোনাজলে সবুজ চারা রাঙা হয়ে মরে গেছে।··· তোমরা তো তিন বছরের বকেয়া টেনে এনেছ, আমার মেহনতের দাম উশুল করি আমি কার কাছ থেকে?



হল। ঘাবড়াচ্ছিস কেন, মোড়ল? ...ক্রোক-ট্রোক কিছু নয়। দিনকাল খারাপ পড়েছে—মুরুব্বিরা এসে নি-খরচায় যুক্তি দিয়ে যায়—তাই নতুন একটা প্যাঁচ কষে রাখা।

কান্ত। ডিক্রি করলে—সেই দিন থেকেই তো কেনা-গোলাম করে রেখেছ। সমিতির খবরাখবর দিই, চাষাদের মধ্যে দল-ভাঙাভাঙি করি, আধমরা মানুষটার মাথা ভেঙে দিয়ে এলাম। এখনো নতুন প্যাঁচ কষছ গোমস্তামশাই, আর আমাকে দিয়ে করাবে কি? আমার নিজের মেয়েটার গলায় ছুরি বসাতে বলবে নাকি? আর কি মতলব আছে তোমাদের পেটে পেটে?

হল। তোর মেজাজ ঠিক নেই মোড়ল। এখন বাড়ি যা—

কান্ত। তোমার পায়ে ধরে বলছি গোমস্তামশাই, নাচের পুতুলের মতো এ সব আমি পেরে উঠছি নে। বুদ্ধির প্যাঁচ না খেলে, আমি বলি কি, গরুর দড়ি এনে আমার গলায় একটা প্যাঁচ কষে দাও। সব চুকে বুকে যাক।

হল। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) কি আবোল-তাবোল বকছিস? বাড়ি যা বলছি, বাড়ি যা—

কান্তরাম চলে গেল। মহেশ্বর ও অরুন্ধতী প্রবেশ করলেন।

মহেশ্বর। হ্যাঁ, ঠিকই। শশাঙ্ক এসেছে। ...তুমি অন্যায় কাজ করেছ, হলধর—

হল। আজ্ঞে?

মহেশ্বর। অনধিকার চর্চা করেছ। কে তোমাকে বলেছে আমাদের লোক ওখানে বসিয়ে রাখতে? মিটিং ভাঙবার হুকুম তোমাকে দেওয়া হয় নি।

হল। আজ্ঞে, তা হয়নি সত্যি। কিন্তু...হঠাৎ যদি আকাশ থেকে

বক্তৃবৃষ্টি শুরু হয়, তাহলে তো ছাতা মেলে মাথা বাঁচাতে হবে…কিম্বা ধরুন, সদর কাছারি ফুঁড়ে একটা গোখরো সাপ বেরোয়, লাঠি নিয়ে মেরে ফেলতে হবে। তখন কি হুজুরের হুকুমের অপেক্ষা করলে চলবে!

মহেশ্বর। ওরা সাপ নয়, হলধর—

হল। সাপের বেহদ্দ, হুজুর। সাপ লাঠি তুললে পালায়, বন্দে-মাতরম্-ওয়ালারা আরও বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে। আমাদেরই এলাকাস্থিত হাটখোলার মাঠে আমাদেরই বিরুদ্ধে—

অরু। ওটা নিছক সত্যিকথা বলছে।

হল। ওকে সত্যিকথা বলেন? কি বলছে, যদি নিজের কানে শোনেন—

মহেশ্বর। আমি যদি শুনি, আমার ঘুম আসবে। বক্তৃতা শুনলে আমার ঘুম পায়। …মারছে না, অকথা-কুকথাও বলছে না, কেবল সাধু সাধু গোটাকতক বাক্য আর চটাপট হাততালি—

হল। তা হলে ও-সব চলবে হুজুর?

মহেশ্বর। চলবে। বকে বকে গলা ব্যথা হয়ে গেলে আপনি থেমে যাবে। তোমার মিটিং-ভাঙা লোকজন যারা আছে, তাদের ডেকে পাঠাও। ওরা সভা করুক, আমরা ইদিককার বন্দোবস্ত করতে লাগি। তুমি নন্দ গোয়ালার বাড়ি গিয়ে দই-ছানার বন্দোবস্ত করোগে…আর ফেরবার মুখে থানাটা ঘুরে দারোগা সাহেবকে নেমন্তন্ন করে এসো। একটা চিরকুট লিখে নাও বরং। লেখো—যা সমস্ত লিখতে হয়। এই যেমন, আমার কন্যার আশীর্বাদ উপলক্ষে সামান্য প্রীতিভোজের

আয়োজন হইয়াছে। আপনি অদ্য রাত্রে সানুগ্রহে মদীয় দীনভবনে—লিখে নিয়ে এসো, সই করে দিচ্ছি।

হলধর ঘাড় নেড়ে চলে গেল। অরুন্ধতী মহেশ্বরকে প্রণাম করল।

মহেশ্বর। কি? কি হল?

অরু। বাবা, ঢেকে বেড়ালে কি হবে—আমি যে তোমায় ঠিক চিনেছি।

মহেশ্বর। আরে, আমায় চিনতে আমার পিতৃপুরুষও পারেন নি। হয়েছে কি?

অরু। বাইরে তুমি গালি দাও, কিন্তু মনে মনে তুমিও ওদের দলে—

মহেশ্বর। ওদের দলে মানে আমিও ঐ ইঁচড়েপাকা স্বদেশিওয়ালাদের একজন?

অরু। হলধরকে তুমি মিটিং ভাঙতে দিলে না—

মহেশ্বর। মিটিং খুব ভাল জিনিষ, মা। বক্তৃতার ভুড়ভুড়ি ছেড়ে ওতে ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। যে সব কুকুরের ডাকা স্বভাব, তারা কামড়ায় না।...হয়ে গেছে হলধর?

হলধর প্রবেশ করল।

হল। আজ্ঞে হ্যাঁ—

মহেশ্বর। সই করে দিচ্ছি। আনো—

মহেশ্বর চিঠিটা পড়লেন

মহেশ্বর। এই হয়ে। পুনশ্চ করে লিখে দাও এই কানিতে—আপনি বিশিষ্ট বন্ধুব্যক্তি, আমার একান্ত আপনার। শুভকার্যের মধ্যে আপনাকে না পাইলে মর্মাহত হইব।

হলধর যথানির্দেশ লিখে সই করিয়ে নিয়ে চলে গেল।

অরু। বাবা, মিথ্যে আশা তোমার। ওরা ঠাণ্ডা হবে না।

মহেশ্বর। যতদিন রক্তটা গরম আছে, ততদিন হবে না। ও-বয়সে ঘাড়ে ঐ রকম ভূত চাপে। আমরা করি নি? তবে হ্যাঁ, বাড়াবাড়ি করছে বড্ড। কালের ধর্ম—বায়ুর আধিক্য চলেছে কিনা! আরে বাপু, সরকার বাহাদুরকে কষে গালাগালাজ দে—জেলে যেতে চাস, সে-ও ভালো; ঘুষ আর ছ-মাস, এক বছর—দশজনে জানুক, বাবু আমাদের কি রকম স্বদেশী। ফিরে এসে দশের ভোট নিয়ে ঢুকে পড় জেলাবোর্ড, ঢুকে পড় কাউন্সিলে, কিম্বা সাহেবদের গিয়ে বল্, হয় ভাল চাকরি দাও, নয় তো স্যার, ডবল করে স্বদেশী করব কিন্তু। ভাল রকম একটা কিছু বাগিয়ে নে—তবে তো বলি বাহাদুর ছেলে!... আর এরা কি করছে—চাষাদের লেলিয়ে দিচ্ছে আমাদের বিপক্ষে। কেন রে বাপু, স্বদেশি করতে এসে নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করে মরিস কেন? আমরা তো তোদেরই দেশের মানুষ!...আবার তোদেরও একদিন সুদিন আসবে, তালুক-মুলুক করবি, বুড়ো বয়সে নিজে বসে খাবি, ছেলেপুলের জন্য রেখে যাবি। ঐ ভাঙিয়ে-চুরিয়ে তাদেরও দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। এই করেই চালাতে হবে যখন, আখের নষ্ট করিস তোরা কোন্ বিবেচনায়? অন্যের চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছে টের পাবে, টের পাবে—'হায়' 'হায়' করে নিজের গাল চড়িয়ে মরতে হবে। আমরা আর ক'দিন?

বিশে বরকন্দাজ এল

মহেশ্বর। বিশে এসে পড়েছিস? রায়সাহেব? আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন—বসুন—

রায়সাহেব ও অচ্যুত এলেন। অরুন্ধতী চলে গেল

মহেশ্বর। পথে কোন কষ্ট হয় নি তো?

অচ্যুত। এমন কিছু না। অসময়ে বৃষ্টি হয়ে গেল—পিছলপথে বার পাঁচেক আছাড় খেয়েছেন। আর হাঁটুর উপর দু-তিন জায়গায় ছড়ে গেছে।

মহেশ্বর। সর্বনাশ! পায়ে যে এক-হাঁটু কাদা—

রায়। কাপড়-চোপড়ও বদলাতে হবে। অবস্থা দেখুন।

রায়সাহেব কাদামাখা কাপড়-চোপড় দেখালেন।

মহেশ্বর। কে আছিস? কানাই, ওরে কানাই!

চাকর কানাই এল

মহেশ্বর। যান, আপনারা ওর সঙ্গে চলে যান।

রায়সাহেব ও অচ্যুত কানাইয়ের সঙ্গে গেলেন

মহেশ্বর। বিশে, তুই তো ডিঙির সঙ্গে গিয়েছিলি। এমন হল কি করে?

বিশে। কোথায় ডিঙি? হেঁটে আসতে হল স্টেশন থেকে এই দেড় ক্রোশ—

মহেশ্বর। কেন?

বিশে। রহিম মিঞা গিয়েছিল। শশাঙ্কবাবুকে তুলে নিয়ে চলে এল, কিছুতে থাকল না। রাগারাগি করলাম, ভয় দেখালাম, কিছুতে না।

মহেশ্বর। শশাঙ্ক যাদু জানে। এসেই মানুষজন পাগল করে তুলছে। আমারই বাড়ির কানাচে বাস রহিম মিঞার—আমার আত্মীয়কে স্টেশনে ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে সে চলে এল। হতভাগা এর পরিণামটা একবার ভাবতে পারল না?…আচ্ছা, তুই তোর কাজে যা বিশে—

বিশে চলে গেল। রায়সাহেব ও অচ্যুত এলেন।

রায়। মুখ বেজার করে বসেছেন যে?

মহেশ্বর। ভাবছি রায়সাহেব, দিনে দিনে হয়ে উঠল কি? মান-ইজ্জত নিয়ে গ্রাম ছেড়ে সরে পড়তে হবে দেখছি।

রায়। কেন? কেন?

মহেশ্বর। এই হাতীপোতা স্বদেশিওয়ালাদের একটা প্রকাণ্ড ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। দলের বড় চাঁইটা আজ আবার এসে উপস্থিত হয়েছে।

রায়। আমাদের ওদিকে এসব কিছু হাঙ্গামা নেই। শাসন চাই, বুঝলেন ভায়া, খুব কড়া নজর রাখতে হয়। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে কি, ছারপোকার মতো টিপে মারতে হবে। তা সে যে-ই হোক—

মহেশ্বর। জোর করে বলবেন না রায়সাহেব। ছেঁড়া-কাঁথার আগুন, কখন কোথায় ছিটকে পড়বে—কিচ্ছু ঠিক করে বলবার জো নেই। ঘর-সংসার করা আজকাল এক বিষম দায় হয়েছে। কখন কার মাথা বিগড়ে যাবে—

রায়। আর যার বিগড়ায় বিগড়াক—আমার সংসারে ওসব হবে না, হলপ করে বলতে পারি। আরে হবে কোত্থেকে? রক্তই যে আলাদা! ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে কোম্পানি বাহাদুরের নুন খাচ্ছি! আমার ঠাকুরদাদা পুলিশে কাজ করতেন, বাবা ছিলেন ডেপুটি, আমি পাবলিক প্রসিকিউটার। কোন পুরুষে আমরা কেউ ভারতমাতার ধার ধারি নে, মশায়। বাপ-ঠাকুর্দা নয়, আমিও না। আমার ছেলে-নাতিও কেউ কোনদিন ও-মুখো হবে না। সকালের পয়লা গাড়িতে আমার ফিরে যেতে হবে কিন্তু। তিন তিনটে জরুরি কেস। কাজকর্ম সব সেরে ফেলা যাক এবার—

মহেশ্বর। মেয়ে দেখা?

রায়। এসেছি যখন, দেখব তো বটেই। সাড়ে আটটা পর্যন্ত

দিব্যি ভালো। দেখলেই হবে। দুটো হাত দুটো পা সব মেয়ের থাকে, আপনার মেয়েরও আছে। কি বল হে অচ্যুত?

অচ্যুত। তা তো ঠিক। তিন গিনি দক্ষিণান্ত করেও রায়-সাহেবকে কেউ নড়ে বসাতে পারে না—সেই মানুষ মক্কেল ভাগিয়ে পায়ে হেঁটে এদ্দূর এসেছেন, পাকা না দেখে কি আমরা অমনি ফিরব?

রায়। আর আর সমস্ত মিটে যাক ভায়া, মেয়ের জন্ত আটকাচ্ছে না—

মহেশ্বর। কিন্তু মুশকিল হয়েছে রায় সাহেব, যে টাকার কথা হয়েছিল—

রায়। হ্যাঁ, আজকে দেবেন পাঁচ হাজার। আর—

মহেশ্বর। সেটার গণ্ডগোল হয়ে গেছে। মানে স্বদেশিওয়ালারই সর্বনাশ করল। জলকর বিলি করতে যাচ্ছিলাম—

রায়। থাক থাক। তার মানে, যোগাড় নেই?

মহেশ্বর। আজ্ঞে না।

রায়। ওঠো হে অচ্যুত—

মহেশ্বর। কেন?

রায়। আমি সাদাসিধে মানুষ ভায়া, সোজা হিসেব বুঝি। মক্কেল টাকা দেয়, তার কাজ করি। আপনি চিঠির পর চিঠি লিখছেন—এসেছি। এখন বলছেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে—ব্যস, ফিরে যাচ্ছি। অনর্থক কর্মভোগ...তা কি করব? শুনলাম, আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। শোনা-কথায় বিশ্বাস করে ঠকলাম। অচ্যুত, উঠলে না?

মহেশ্বর। এখন কোথায় যাবেন?

রায়। স্টেশনে।...ফিরে যাব। আমার সময়ের দাম আছে।

মহেশ্বর। ফিরে যাবেন কেন? আজকে যোগাড় নেই বলে কি

আমি দেব না বলছি? পায়ের ধুলো দিয়েছেন যখন, মেয়ে দেখুন—আর আর কথাবার্তা হোক—

রায়। লাভ নেই ভায়া, কিছু লাভ নেই। ছেলেকে কলকাতা হোস্টেলে রেখে পড়াচ্ছি। মাসে দেড়শ' টাকা করে খরচ।...মেয়ে দেখে কি হবে? স্বীকার করলাম, খুব রূপ আছে—কাঁচা সোনার মতো রং। তাতে কুলোবে না,—রূপো লাগবে, সোনা লাগবে, নগদ—

মহেশ্বর। আমি সমস্ত দেব। যা বলেছি, কিছু নড়চড় হবে না।...বসুন, ভাল হয়ে বসুন রায়সাহেব। হঠাৎ একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বেকুব করল। কিন্তু হাতীপোতা তালুক ষোল আনা আমার। তালুক বন্ধক দিয়ে আমি আপনার দাবি মেটাব। শুধু সাতটা দিন সময় চাচ্ছি—

অরুন্ধতী প্রবেশ করল

অরু। এসো বাবা, মকরধ্বজ মেড়ে রেখে এসেছি।

মহেশ্বর। তা তুই এলি কেন? আর কেউ—

অরু। রোজই তো আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাই।

মহেশ্বর। এখন যা। এঁদের সঙ্গে জরুরি কথা হচ্ছে—

অচ্যুত। বেশ তো, অষুধ খেয়েই আসুন গে। আমরা কোথাও যাচ্ছিনে, মশায়। মোটা মানুষ, দিনমানে আসতেই পাঁচবার আছাড় খেয়েছেন। রাত্তিরবেলা রাস্তায় যে গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে হবে।

অরুন্ধতী ও মহেশ্বর চলে গেলেন

রায়। ওহে অচ্যুত, বল দিকি মেয়েটি কে? কি মনে হয় তোমার? মহেশ্বরবাবুর আর কোন মেয়ে আছে, শুনি নি তো—

অচ্যুত। খুব ফরোয়ার্ড মেয়ে স্বীকার করতেই হবে। বাপের হাত ধরে ফরফরিয়ে বেরিয়ে গেল, আমাদের আমলেই আনল না।

রায়। আমি বলছি অচ্যুত, এ ঠিক সেই—

অরুন্ধতী পুনরায় প্রবেশ করল।

অরু। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই অরুন্ধতী। শ্রীযুত মহেশ্বর ঘোষ চৌধুরী মশায়ের মেয়ে।

অচ্যুত। আচ্ছা মেয়ে তো তুমি! লাজলজ্জা নেই, আগ বাড়িয়ে এসে হুমকি ছাড়ছ—

রায়। থামো অচ্যুত, বাজে বকবক কোরো না। ...বেশ হয়েছে মা, এমনই দেখে নিলাম। তোমাকেই আশীর্বাদ করতে এসেছি আজ।

অরু। এসেছিলেন, কিন্তু বাবা আশীর্বাদের দাম দিতে পারলেন না—

রায়। না, ঠিক টাকার ব্যাপার নয়। উনি কথা দিয়েছিলেন, কথার খেলাপ করে বসলেন। আমি আবার এককথার মানুষ কিনা! তাই একটু বিচার-বিবেচনা করছি, একেবারে জবাব দিই নি এখনো। তা একটা কথা বলি মা, কথাবার্তা তোমার বাবার সঙ্গে। এর মধ্যে তোমার এমন করে আসাটা কি উচিত হয়েছে?

অরু। বাবার কথাবার্তা বাবা বলবেন, আমার একটা কথা আছে— সেইটে বলে যাচ্ছি। বাবা এক পয়সাও দিতে পারবেন না।

অচ্যুত। আজকে পারবেন না। সাত দিনের মধ্যে দেবেন—

অরু। সাত দিনে নয়, সাত বচ্ছরেও নয়—

রায়। মোটে দেবেনই না?

অরু। আমি দিতে দেব না। ওতে আমার অপমান। আমাকে আর একজনের সংসারে গছিয়ে দেবার জন্য টাকা ঘুস দিতে হবে, পৃথিবীর এত বড় ভার-বোঝা বলে আমি নিজেকে মনে করি নে।

রায়। ছি ছি ছি, একি কথা! তুমি ভার-বোঝা কেন হবে? তুমি হবে আমার মা। রায় সাহেব অবিনাশ মিত্তিরের মা হয়ে তুমি যাবে

এমন ছেলে তোমার—জেলার মধ্যে সবাই এক ডাকে চেনে, পরিচয় দিতে হয় না—

অরু। ঈশ্বর করুন, আমার ছেলে যেন কখনো রায়সাহেব না হয়—

অচ্যুত। আচ্ছা ডেঁপো মেয়ে তো তুমি! রায়সাহেবের মুখের উপর—

রায়। ঠিক বলেছে—ঠিক বলেছে অচ্যুত। সত্যিই তো! হাতী-পোতার মেয়ে—কত বড় বংশ! রায়সাহেবে কি খুশি হতে পারে? আমিও কি খুশি হয়েছি? আমার মতো লোককে মোটে একটা রায়সাহেব করে দিয়ে গভর্নমেন্ট কি সুবিচার করেছে?...তা হলে ভিতরের কথা বলে দিই। এইবারে বার্থডে-লিস্টে দেখো মা আমি রায় বাহাদুর হয়ে গেছি। সব ঠিক আছে। লিস্ট বেরোবার মোটে দু'-হপ্তা বাকি। তখন তোমার আর কিছু ক্ষোভ থাকবে না তো? উঁ?

অরু। আমার বাচালতা মাপ করবেন। বিয়ের কনে বোবা সেজে থাকে, তার মনের কথা কেউ কোনদিন জানতে পারে না।... অন্যে এসে গায়ের রঙ মেজে মাথার চুল মেপে হাঁটিয়ে দেখে দরদস্তুর শুরু করে, দুঃখে অপমানে তখন আমাদের পাতালে যেতে ইচ্ছে করে।

নমস্কার করে অরুন্ধতী চলে গেল।

অচ্যুত। পাহাড়ে মেয়ে!

~~[illegible]~~ রায়। বড় ঘরের মেয়ে। কি রকম তেজ দেখলে তো, অচ্যুত?

অচ্যুত। ও তেজ বাইরে থেকে বেশ লাগে। ঘরে নেবেন না; সামলানো দায় হবে। লঙ্কাকাণ্ড করে ফেলবে। কনে না দেখে যে বড় চলে যাচ্ছিলেন! পারলেন? কনে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়তে লাগল। চোখ বুজে থাকবেন, তা-ও তো ভরসায় কুলোলো না, মশায়—

সভা সমাপ্তপ্রায়। আকবর আলি বক্তৃতা করছে।

আকবর। সভার শেষে ধন্যবাদ দেবার ভার পড়েছে আমার উপর। কিন্তু সভানেত্রী হয়েছেন আমাদের মা। ধন্যবাদ দিতে যে ব্যবধানটুকু চাই, মা আর সন্তানের মধ্যে তা নেই। মায়ের স্নেহ-নির্দেশেই এত বাধাবিপত্তির মধ্যে এগিয়ে যেতে ভরসা পাই আমরা। এই যে শশাঙ্ক-দা—দেহশ্রী পাণ্ডুর, কিন্তু মনকে দমিয়ে রাখতে পারে এমন ক্ষমতা পৃথিবীর কারো নেই—এই তেজ এই শক্তি মা দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর এত বড় হলেন ভগবতী দেবীর মতো মা ছিলেন বলে। আলি-ভাইদের অন্তরের আগুনে ইন্ধন জোগাতেন তাঁদের মা—বি-আম্মা বেগম। মায়ের নামে তাই আমরা পাগল হয়ে উঠি। দেশকে বলি দেশমাতা; বন্দেমাতরম্ বলে হাসতে হাসতে আঘাতের সামনে বুক পেতে দিই। মাকে ধন্যবাদ দিয়ে কর্তব্যের দায় সারব কোন লজ্জায়? ...আমি কেবল ধন্যবাদ দিচ্ছি কলকাতার এই দু'টি বন্ধুকে—শশাঙ্ক-দার অনুপস্থিতিতে যাঁরা দুর্গম পল্লীতে এসে সমিতির সমস্ত ভার কাঁধে নিয়েছিলেন। এঁদের ঋণ গরিব গ্রামবাসী কোনদিন শোধ করতে পারবে না।

আকবর আলি বসল

মা। এইবার গণগীতি।

সমবেত-কণ্ঠে গণগীতি শুরু হল—

হে জনগণ, তিমির-নিশার ওপারে হের কি
অরুণোদয়?
গগনপ্রান্ত লালে লাল হল—
ভয় নাই আর ভয় নাই, নাহি ভয়!

প্রভাতের লাগি যুগে যুগে ভাইবোন
শক্তিমানের সয়েছে নির্যাতন।
তমোবিদারণ ঐ যে অরুণ ওঠে—
শ্মশান-ভস্মে রঙিন কুসুম ফোটে—
পুলক-প্লাবন ঐ আসে—গাহ জয়
গাহ জয়!
কোনখানে কেউ ছোট নাই, নহে হীন—
দেশ স্বাধীন, মানুষেরা সুখী স্বাধীন—স্বাধীন—
ধরণীতে জাগে আনন্দ-গান
জানোয়ারদের হানাহানি অবসান—
অত্যাচারের হল লয়, গাহ জয়—গাহ জয়।

মা। সভাভঙ্গ হল।

আকবর। আস্তে আস্তে চলে যান সবাই। গোলমাল করবেন না।

সন্তোষ। গান শুনে যে তালগোল পাকিয়ে উঠল—

আকবর। সে কি?

সন্তোষ। মাথায় নয়, পেটের মধ্যে। বিষম খিদে পেয়েছে।

শশাঙ্ক। ওঠ, বাড়ি যাওয়া যাক।

সন্তোষ। আগে পালিখানেক মুড়ি আনাও দিকি কোনও একটা দোকান থেকে—

প্রবীর। হল কি সন্তোষ?

সন্তোষ। ইঞ্জিনে স্টিম ফুরিয়েছে। অচল অবস্থা। কয়লা চাপাতে হবে, সেই কথা বলছি। বাপরে বাপ! তোমাদের মিটিঙের পায়ে দণ্ডবৎ—মিটিঙের উদ্যোক্তা আকবর আলির পায়ে দণ্ডবৎ।

শশাঙ্ক। কেন, কি করল আকবর আলি ?

সন্তোষ। একেবারে কিছু করল না। তাই তো অভিযোগ। তিন ঘণ্টা ধরে ভ্যানর-ভ্যানর চলছে—তার মধ্যে এক কাপ চায়েরও পিত্যেশ নেই। খালি পেটে দেশ-উদ্ধার আমার দ্বারা পোষায় না।

প্রবীর। তুই একটা আস্ত রাক্ষস। এই তো বিকেলে ভরপেট জলখাবার ঠেসে এলি।

সন্তোষ। জলখাবার মানে ? চিঁড়ে গুড় আর দুধ সের দেড়েক। চিড়ে ক'টা তো দাঁতের ফাঁকেই সেঁধিয়ে আছে, পেট অবধি পৌঁছয় নি। মহাত্মা গান্ধীকে মাথার উপর রাখছি—কিন্তু গান্ধীমার্কা জলযোগ পেটে দিতে নিতান্ত নারাজ, তা তোমরা যাই বলো।

রহিম। কর্তামশাই—কর্তামশাই—

প্রবীর। মহেশ্বরবাবু আসছেন যে !

মহেশ্বর প্রবেশ করলেন।

মহেশ্বর। হ্যাঁ বাবা, এলাম তোমাদের সভায়। সেদিন নেমন্তন্ন করে এসেছিলে, ভুলে গেছ ? সভা ভেঙে গেছে বুঝি ? ঈস, দেরি করে ফেললাম। বড্ড কৌতূহল হচ্ছিল ছেলেরা কি বলে শুনবার জন্য—

শশাঙ্ক। আপনার নিন্দেমন্দ করছিলাম, কাকাবাবু।

মহেশ্বর। আমার নিন্দে ? তা নিন্দের আমি যোগ্যই বটে। হাতীপোতার কি ছিল, আর কি হয়ে দাঁড়িয়েছে ! স্বর্গীয় কর্তারা কত কি করে গেছেন ; আমরা প্রজাদের পরে কোন কর্তব্য করে উঠতে পারি নে। তাই প্রজা-মনিবের মধ্যেকার মনের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। এসব আমি মনে মনে অনুভব করি।···তোমরা কি-ই বা জানো, কতটুকু আর নিন্দে করবে ! একদিন আমার একটু বক্তৃতায়

লাগিয়ে দিও তো—খুড়ি খুড়ি নিন্দে করে যাব—ফুরবে না।...রহিম মিঞা, তোমায় না হলধর স্টেশনে পাঠিয়েছিল ?

রহিম। গিয়েছিলাম। তা শশাঙ্ক-ভাইকে নিয়ে আসতে হল।

মহেশ্বর। তুমি এনেছ শশাঙ্ককে ? বেশ, বেশ। ভ্যাগ্যিস গিয়েছিল রহিম। নইলে মহা মুশকিল হত। আহা-হা, সোনার শরীর কালীবর্ণ হয়ে গেছে। বেশ করেছ রহিম, তুমি যে রায়সাহেবের জন্ত বসে না থেকে শশাঙ্ককে নিয়ে চলে এসেছ—বুদ্ধির কাজ করেছ। সে বেটা মানুষ নয়—অতি পাষণ্ড—এক নম্বর চশমখোর।...নাও—

মহেশ্বর রহিমকে একটা টাকা দিলেন

রহিম। টাকা ? কিসের টাকা ?

মহেশ্বর। নৌকো-ভাড়া। আমি পাঠিয়েছিলাম, ভাড়া আমিই দেব।...হাঁ করে কি দেখছ, শশাঙ্ক আমার পর নয়—যাকে আনতে গিয়েছিলে সেই কঞ্জুষ বেটার চেয়ে অনেক বেশি আপনার। রায়গিন্নিকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ।...সময়ে অসময়ে গায়ের জ্বালায় দু'টো-একটা তেতো কথা বলি বটে, কিন্তু মনে মনে আমি কি বুঝিনে বাবা, তোমার কত দাম—তোমার কত বড় হৃদয়—গ্রামের কত বড় সম্পদ তুমি! একটা নিবেদন আছে, রায়গিন্নি। বুড়োমানুষ—এই এদ্দূর অবধি চলে এসেছি কেবল সভাশোভন করতে নয়—

মা। সে তো জানিই, ঠাকুরপো। বলো কি বলবে—

মহেশ্বর। শশাঙ্ক ফিরেছে, গ্রামের সবাই ছুটে আসছে। আমিও চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে পারলাম না।...নিবেদনটি হচ্ছে, আমার বাড়িতে আজ রাত্রে যৎসামান্য আয়োজন করেছি। আমার বড় ইচ্ছে, সবাই একসঙ্গে বসে দুটো শাকভাত খাই। শশাঙ্ক আর এই যে দু'টি

বিদেশি ছেলে আমাদের এখানে এত খাটনি খাটছে এরা তিন-জনেই—

প্রবীর। না না—আমাদের কেন?

মহেশ্বর। কেন, কিজন্য—এসব হেতু দেখিয়ে কাজ করা হাতীপোতার অভ্যাস নয়, বাবা। এতক্ষণ ধরে এত নিন্দেমন্দ শুনলে—শোন নি, আমরা কি রকম অত্যাচারী?···এককালে রোদে চোদ্দ-পোয়া করে দিয়ে গাছের গুঁড়িতে হাত-পা বেঁধে আমরা খাজনা আদায় করতাম। নিমন্ত্রণ খাওয়াবার জন্যও যদি আজ সে রকম কিছুর দরকার হয়—

সন্তোষ। না না মশায়, ভয় দেখাবেন না—হাত-পা বাঁধতে হবে না, পা দিয়েই হেঁটেই যাব আমরা।···আপনি অনেক খেয়ে থাকেন, আমরা খেতে পাই নে—সেই দুঃখেই স্বদেশি করে বেড়ানো। আপনি যখন খেতে ডাকছেন, কেন যাব না আপনার বাড়ি—নিশ্চয় যাব।

মহেশ্বর। তা হলে চলি এবার। যদি কিছু এখনো বাকি থেকে থাকে, মন খুলে আমার কুচ্ছো করো। আচ্ছা—

আকবর আলি উত্তেজিত ভাবে মাকে কি বলল

মা। শোন ঠাকুরপো, এরা নিমন্ত্রণ নিয়েছে, এরা যাবে। শশাঙ্ক যেতে পারবে না।

মহেশ্বর। পারবে না? কেন, জিজ্ঞাসা করি—

মা। শরীরের এই অবস্থায় নিমন্ত্রণ খাওয়া—

মহেশ্বর। শশাঙ্কের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করব, রাঙাগিন্নি।···চুপ করে রইলেন যে! আমার বাড়িতে যাবে—আপত্তি কি তা হলে সেই জায়গায়? যখন শশাঙ্ক ছোট ছিল, দিনের মধ্যে বেশি সময় সে থাকত আমার ওখানে। আমি কত স্নেহ করতাম, কাছারিতে নিয়ে কোলের উপর বসিয়ে রাখতাম। কত আশা ছিল আমার!

মা। সেসব কি ভুলতে পারি ঠাকুরপো? সব মনের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। শশাঙ্ক, তোমার কাকাবাবুকে প্রণাম কর নি এখনো?

শশাঙ্ক মহেশ্বরকে প্রণাম করল।

মা। এবার আমরা যাচ্ছি ঠাকুরপো—

মহেশ্বর। ওরা যাক, আপনি দাঁড়ান; আমি নিজে আপনাকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে আসব।

আর সকলে চলে গেল।

মহেশ্বর। শশাঙ্ককে প্রণাম করতে বললেন, রায়গিন্নি। বাধ্য ছেলে আপনার, সে প্রণাম করল। কিন্তু ঐ শুকনো প্রণামে আমার তৃপ্তি হয় না। আমি জানি, আপনারা আমায় ঘৃণা করেন।

মা। না, ঘৃণা নয়—

মহেশ্বর। তবে? বলতেই হবে খুলে। ঘৃণা যদি না করেন, তবে সমাজ-সম্বন্ধ ভুলে যাবার মানে কি?

মা। স্পষ্ট কথা শুনতে চাও ঠাকুরপো? শুনলে যে দুঃখ পাবে।

মহেশ্বর। দুঃখ দিতে বাকি কি রেখেছেন রায়গিন্নি? জানেন, আমার সাধ ছিল—অরুন্ধতীর বিয়ে দেব শশাঙ্কের সঙ্গে। কিন্তু বলিহারি আপনি মা! সোনার ছেলেকে যমের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন, তবু আমায় দিলেন না।

মা। আমার কপাল ঠাকুরপো। সাধারণ আর দশজনের মতো হল না ছেলে—

মহেশ্বর। কপাল নয় রায়গিন্নি, আপনারা গর্ব। মুখে বলছেন কপালের কথা, চোখে তো দুঃখের ছায়া নেই? আছে হাসি, আছে আনন্দ। ছেলের কথা বলতে বলতে আপনার বুক ভরে ওঠে।...সেই পুরাণো দরবারটি আর একবার করছি রায়গিন্নি, দিন আপনার

অরু। দেখবার চোখ তাঁরও নেই। তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে ভাবী-ধরিত্রীর স্বপ্ন, তাঁর চোখ ঢেকে রয়েছে পয়লা কিস্তির কর্‌করে নগদ টাকা পাঁচ হাজার—

শশাঙ্ক। পাঁচ হাজারের জোগাড় হল না কিছুতে?

অরু। তোমাদেরই দোষে। অন্ধের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ। চাষারা রুখে দাঁড়াল, আবাদ ভাসানো হল না। নগদ টাকা বুঝে নিয়ে রায়-সাহেব জায়গা দিতে চেয়েছিলেন, ভদ্রলোক এখন বিগড়ে যাচ্ছেন।··· কি করা যায় বলো তো শশাঙ্ক-দা? বিনি-পয়সায় ঠাঁই দেবে, এমন মহানুভব কে আছে?

শশাঙ্ক। তাই তো—

অরু। আমাদের পাতালপুকুরের জলে জায়গা হয় বটে, তাতে সিকি পয়সা খরচা নেই।···কিন্তু শশাঙ্ক-দা, তুমি কি একটু জায়গা দিতে পার না?

শশাঙ্ক। কি বলছ অরুন্ধতী? মানে কি এসব কথার?

অরু। এই দেখ শশাঙ্ক-দা, তুমি ভাবলে বিয়ে করবার জন্ম খোসামোদ করছি তোমাকে। স্বাধীন দেশের মানুষ না হয়ে বিয়ে-থাওয়া করবে না, সে তো জানিই।···জিজ্ঞাসা করছি, তোমার দলের মধ্যে আমার কি একটু জায়গা হয় না?

শশাঙ্ক। এখানে জায়গা কেউ করে দেয় না। এ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারাই, পৃথিবীর ভণ্ডামি যাদের একেবারে অসহ্য হয়েছে। সাধারণ শান্ত ভদ্রজীবন তাদের কাছে এত বিষাক্ত যে আগুনকেও তারা মধুর বলে মনে করে। এ পথ তোমার নয়, অরুন্ধতী—

অরু। ওঃ, দৈবজ্ঞ ঠাকুর কিনা! খড়ি পেতে বলে দিচ্ছেন, এ পথ আমার নয়।

শশাঙ্ক। তুমি বড্ড ভাল, অরুন্ধতী। তোমায় স্নেহ করি। এত টুকু জ্বালা তোমায় স্পর্শ করে, এ আমি চাই নে। শান্ত মাধুর্যে তোমার জীবন ভরে যাক।

অরু। শান্তি কোন দিনই পাব না, শশাঙ্ক-দা —

শশাঙ্ক। কেন?

অরু। শৈশব থেকে বড়বাড়ির আওতায় বড় হচ্ছি। মাটির মানুষ থেকে আলাদা হয়ে আছি। আমার বড় সাধ, দশের একজন হয়ে থাকবার। কিন্তু তা হবার জো নেই। রায়সাহেব আজ যদি ফিরেও যান, বাবা শুনবেন না—আবার ওঁদেরই আর একজন কেউ আসবেন। আমি চেয়েছিলাম, সাধারণ গরিবঘরে সামান্য সংসার পাততে—

শশাঙ্ক। ও তোমার একবেলার একটা শখ। যেমন সুপ্রচুর আহারের পর একবেলা উপোষ দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু উপোষ ঐ একটা বেলাই চলে, তার বেশি নয়। যদি দারিদ্র্যের সঙ্গে সত্যি সত্যি পরিচয় হয় কখনো, একবেলাতেই হাঁপিয়ে উঠবে।

অরু। আমায় চেনো না, শশাঙ্ক-দা—

শশাঙ্ক। তুমি অদ্ভুত কিছু নও। পৃথিবীর সব মানুষ যা, তুমিও তাই। শোন, দারিদ্র্যের চেয়ে মহাপাপ আর নেই। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য মানুষ যে কোন অন্যায় করুক, আমি তা অপরাধ বলে মনে করব না।

অরু। দারিদ্র্যে আছে শান্তি—

শশাঙ্ক। নিতান্ত মামুলি শোনাচ্ছে, অরুন্ধতী। যারা রোলস্‌রয়েস থেকে নেমে গণ-বেদনায় কেঁদে বক্তৃতা করেন, কিম্বা দামি সেটিতে পাখার নিচে বসে দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য নিয়ে সাহিত্য লেখেন, তাঁদেরই

মতো।···জানো, ঘি নামক একটা ভোজ্যবস্তু আছে, আমার দেশের শতকরা নব্বুই জন তার নামই শুনেছে, একটা বার চোখে দেখবার সুযোগ পায় নি। ছ'বেলা দু'মুঠো ভাত তারা মনুষ্যজীবনের চরম বিলাসিতা বলে জেনে রেখেছে। তা-ও জোটে না। মাঠের ঘাস সিদ্ধ করে খেয়ে কাটায়। কল্পনা করতে পার?···আমি যে দেশের স্বপ্ন দেখছি অরু, সেখানে সব মানুষ ভাল খায়, ভাল পরে; পৃথিবীর সব সম্পদ সকলের কাছে অবারিত; সকলেই ভোগী।

অরু। কিন্তু তুমি নিজে? তুমি কি ভোগ করে গেলে শশাঙ্ক-দা?

শশাঙ্ক। এর জন্যে কি সুখী আমি? না বোন, মোটেই না। অনেকের অনেক দিন জমানো অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হল আমার উপর দিয়ে। সংসার আমার জন্য নয়। শান্তি বলো, সুখ বলো—সেসব আমি নিলাম না। আমি আর আমার অগণিত বন্ধুবান্ধব—যারা পথে পথে ভেসে গেলাম, আমাদের ভেসে-যাওয়ার বদলে তোমাদের লক্ষ লক্ষ সংসার যেন আনন্দে সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। নইলে মনে হবে, বৃথাই আমাদের আত্মবঞ্চনা।

ভিতরের দিক দিয়ে সন্তোষ ও প্রবীর এল।

প্রবীর। যাচ্ছি আমরা—

শশাঙ্ক। এর মধ্যে? সবে তো সন্ধ্যে—

প্রবীর। সন্তোষটা মোটে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না—

সন্তোষ। ক্ষিধে পেয়ে গেছে। নেমন্তন্ন-বাড়ি চেপে বসাই ভাল, শিগগির শিগগির দিয়ে দেবে।

প্রবীর ও সন্তোষ চলে গেল।

অরু। সেই কলকাতার ছোকরা দুটো?

শশাঙ্ক। চল, তোমাদের বাড়ি—

পঞ্চম দৃশ্য ঘোষকর্তার বাইরের ঘর

রায়সাহেব, অচ্যুত ও মহেশ্বর। হলধর প্রবেশ করল।

রায়। কারা ঐ ছোকরা দু'টি—জামাই-আদরে বসিয়ে এলে?

চল। আজ্ঞে, বিদেশি। কলকাতা থেকে এসেছে সমিতির কাজ করতে।

মহেশ্বর। আজ রাত্তিরে খেতে বলেছি। আসলটা ছিটকে বেরিয়ে গেল, লেজুড় দুটো এসেছে।

রায়। খেতে বলেছেন? দুধ-কলা খাইয়ে সাপ বশ করবেন? ছোবল মারবে তারা, ছোবল মারবে। এইসব করেই তো আপনারা বাড়িয়ে তোলেন। কই, যাক দিদি আমাদের গাঁয়ে।...ওদের ঠাণ্ডা করবার ওষুধ হচ্ছে আলাদা। খাইয়ে দাইয়ে নয়।

আমিরুল প্রবেশ করলেন

মহেশ্বর। আসুন, দারোগা সাহেব—

রায়। দারোগা সাহেব? ওদের ওষুধ এই এক নম্বর হলেন এঁরা।

মহেশ্বর। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন রায় সাহেব অবিনাশ চন্দ্র মিত্তির; অরুকে দেখতে এসেছেন। আর ইনি এখানকার থানার ও. সি. মিস্টার আমিরুল হক—আমার পরম বন্ধু, আত্মীয়ের অধিক বললে হয়।

রায়। এ রকম আত্মীয়াধিক ব্যক্তি থাকতে চাল-ডাল-মাছ-মাংসের অপব্যয় করছেন কেন শুনি?

আমিরুল। চাল ডালের অপব্যয় কি রকম?

রায়। স্বদেশি-ওয়ালারা ভদ্রলোককে উস্কে দিয়ে তুলেছে। কলকাতা

থেকে এসেও হানা দিচ্ছে। ওর কোন ব্যবস্থা হয় না, দারোগা সাহেব?

আমিনুল। উদ্ব্যস্ত আমরাও কম হচ্ছি নে, রায়সাহেব। বিশ বছর এই লাইনে আছি, মাছ-দুধ পয়সা দিয়ে কিনতে হয় জানতাম না। এখনই দেখছি বাজারে গিয়ে দাঁড়ালে বেটারা দর হাঁকে, ইউনিফর্ম পরে গেলেও ছাড়ে না। এদিক-ওদিক আধলা-পয়সার বন্দোবস্ত করতে গেলে অমনি রিপোর্ট চলে যায়। বলুন দিকি, মাইনের এই শুখো ক'টা টাকার জন্যে কেউ কি চাকরি করতে আসে? সে সব তো বিবেচনা করবে না স্বদেশি-শালারা!·· ক'টা আর বলি মশায়, হাড় একেবারে ভাজাভাজা করে দিলে।

রায়। বলতে হবে না, না বললেও বুঝতে পারি। ·· আমার অসুবিধা হলে তার আঁচ আপনার গায়েও ঠিক লাগবে। ঐ যে জাত-বেজাতের কথা বলে থাকে—হিন্দু আর মুসলমান—ও-সমস্ত নেই আজকাল। হিন্দু হই আর মুসলমান হই—আপনি আমি একগোত্র। টিকে থাকতে হলে আমাদের একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে, যেটা মাথা তুলবে, তক্ষুনি সেটার টুঁটি চেপে ধরব।·· পালের গোদাটাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন—খাসা করেছিলেন, চমৎকার কাজ করেছিলেন—কিন্তু বাইরে থেকে বিচ্ছু এসে হুল ফুটিয়ে যায়, তার তো কিছু করেন নি।

আমিনুল। আপনি ধরেছেন ঠিক, রায়সাহেব। কলকাতা থেকে ছোঁড়া দুটো যদি না আসত, এদ্দিনে বোধ হয় এদিকে ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

রায়। আসে কেন?

আমিনুল। গবর্নমেন্ট রেল-স্টিমার করে দিয়েছেন, পয়সা দিলেই চড়া যায়। গবর্নমেন্টকে গালিগালাজ করতে আসে ঐ গবর্নমেন্টেরই রেল-গাড়ি চড়ে। তার তো কোন বাধা নেই!

রায়। বাধা আপনার আমার হাতে। সে কি আর পেনালকোডে

লেখা থাকবে ?...সত্যি দারোগা সাহেব, ইদানীং আপনারা একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে যাচ্ছেন।

আমিনুল। তার মানে ?

রায়। বিশ বছর পুলিশে চাকরি করছেন, মানেটা কি আমাকেই বলে দিতে হবে ?

আমিনুল। দিন-কাল বড্ড খারাপ, রায়সাহেব। ঐ স্বদেশি-শালাদের কতক আবার কাউন্সিলে ঢুকে বেয়াড়া আইন পাশ করিয়ে নিচ্ছে।

রায়। আইন পাশ হচ্ছে কলকাতায়। যাচ্ছেতাই হোক সেখানে—হাতীপোতার তাতে কি ? আপনার কড়া নজর যদি থাকে, তিন-তিনটে জেলা পার হয়ে কলকাতার আইন এখানে পৌঁছতে পারে ?

আমিনুল। আমারও অবশ্য এক-একবার মনে হয়েছে, দিই ও-দুটোকে একটা কেসে জড়িয়ে—

রায়। দিলে ভাল করতেন। আর এ-মুখো হত না। ইঁদুর গর্ত খুঁড়তে আসে নরম মাটিতে—পাহাড়ের পাথরে নয়।

আমিনুল। দেব নাকি তা হলে এক খেলা খেলে ?

রায়। সুবিধে আছে ?

আমিনুল। কেশবপুর গঞ্জে গহর আলি ব্যাপারির বাড়ি এক ডাকাতি হয়ে গেছে। তার এনকোয়ারি চলেছে এখনও—

রায়। এরা যে তার মধ্যে নেই তার প্রমাণ কি ?

আমিনুল। নেই, তা সত্যি। বাগদিরা খেতে পায় না, তারাই করেছে। তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়েছি। অন্য চাক্ষুষ-সাক্ষিও আছে।

রায়। চাক্ষুষ-সাক্ষি এ-ও তো বলতে পারে যে বাগদিদের মধ্যে ছিল ঐ বিদেশি ছোকরা দুটো—

আজিজুল। তা অবশ্য পারে। বলাতে চাই যদি, বলবে না কেন? তবে দেখেছি রায় সাহেব, শেষ পর্যন্ত জেরায় টেকে না—খালাস পেয়ে যায়।

রায়। খালাস পেলেও কাজ হাসিল হবে। জিজ্ঞাসা করি দারোগা সাহেব, আপনারা যত কেস দেন, সব কি ষোলআনা খাঁটি জেনে দিয়ে থাকেন? তার একটাও কি ফেঁসে যায় না?

আজিজুল। তা হলে দিই জুড়ে? আপনি কি বলেন মহেশ্বরবাবু?

মহেশ্বর। আগে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দেখুন। ওদের মাথার উপরে বাপ-খুড়ো যাঁরা আছেন, তাঁদের জানিয়ে দিন।

আজিজুল। বাপ-খুড়োর খবর জানব কি করে। আমার তো সন্দেহ হয়, নিজের নাম যা বলে, সেইটেই খাঁটি নয়। একদিন স্টেশনের স্টলে নিয়ে খাতির করে ওদের চা খাওয়ালাম। কলকাতায় কোথায় থাকে, সেই কথাটা জানবার জন্য কত চেষ্টা করলাম, তা কিছুতে ভাঙল না।

রায়। হলধরবাবু, কোথায় বসিয়ে এলে ওদের? একবার আনো দিকি এখানে—

মহেশ্বর। বলো গিয়ে, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আলাপ করতে চান।

হলধর চলে গেল।

রায়। বাপ তো বাপ—চোদ্দপুরুষ অবধি টেনে বের করব। জেরায় স্পেশ্যালিস্ট বলে আমার নাম। দেখুন না কি করি—

হলধরের সঙ্গে প্রবীর ও সন্তোষ প্রবেশ করল।

মহেশ্বর। রায়সাহেব একটু আলাপ করতে চান আপনাদের সঙ্গে।

রায়। না না না। যাও হলধর, যেখানে ছিল সেইখানেই নিয়ে যাও।

হল। আজ্ঞে ?

রায়। যাও, যাও—

ওরা তিনজনে বেরিয়ে গেল।

মহেশ্বর। কি হল, রায় সাহেব ?

রায়। দূর—দূর···ছুটো চেংড়া ছোঁড়া। ওদের সঙ্গে আলাপ করলে ইজ্জত থাকে ?

আমিনুল। দরকার কি ? কুটুম্বিতে হচ্ছে না যে, চোদ্দপুরুষের খোঁজখবর করতে হবে। রায়সাহেবের যুক্তিই ভাল, ডাকাতি-কেসে জড়িয়ে দিই—নাম-ধাম হাঁড়ির খবর আদালতেই বেরিয়ে আসবে।

রায়। কিন্তু ভায়ার যুক্তিটাই সমীচীন মনে হচ্ছে। আগে একটা ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত।

আমিনুল। কিছু না, কিছু না। সাপকে খোঁচা দিয়ে ছাড়তে নেই। তাতে কাজ হবে না, উল্টো উৎপত্তি হবে।

মহেশ্বর। কাজ হবে না, সে আমিও জানি। মিষ্টি ব্যবহার আমি কি কম করেছি ? তা হলে রায়সাহেব যা বলেছেন—সেইরকম করেই দেখা যাক। দিন জড়িয়ে।

রায়। না না। নরমে গরমে চলা উচিত, দারোগা সাহেব। ভায়ার কথা শুনুন, এবারে ওয়ার্নিং দিয়ে দিন।

মহেশ্বর। উঁহু। আপনার কথা মতোই—

আমিনুল। নিশ্চয়, পাকা মাথা রায়সাহেবের। ঠিক বুদ্ধি বাতলেছেন। আর কোন কথা নয়। ···আপনি একবার আসুন তো, মহেশ্বরবাবু—

মহেশ্বর ও আমিনুল চলে গেলেন।

অচ্যুত। এ কি রকম হল, রায়সাহেব ?

রায়। কি ?

অচ্যুত। আপনার জেরার সময় আদালতে ভিড় জমে যায়; আসামির বাপের নাম ভুলিয়ে দেন। আর এখানে—

রায়। বাপ যে আমি—

অচ্যুত। আজ্ঞে ?

রায়। চশমা পরে চোখ মিট-মিট করছিল, ও-গর্দভটি আমারই সন্তান, অচ্যুত।

অচ্যুত। বলেন কি ? শুনেছি ভাল ছেলে আপনার—

রায়। তাইতো বিশ্বাস ছিল। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এম.এ. পড়ছে। ছুটিতে বাড়ি যায়, তখন ভিজে-বিড়ালটি। ইতিমধ্যে কোন ফাঁকে হারামজাদা দেশনেতা হয়ে উঠেছে—

অচ্যুত। দারোগাকে ডেকে সব খুলে বলুন শিগগির। ওরা কিন্তু জড়াবার মতলব করছে—

রায়। বললে যে আমি সুদ্ধ জড়িয়ে যাব। এককান দু'কান করতে করতে কালেক্টরের কানে পৌঁছে যাবে, বার্থডে-লিস্টে দেখবে সব ফক্কিকার। হিরণ্যকশিপুর বেটা প্রহ্লাদ—হতভাগা সমস্ত মাটি করল। ওর যদি ফাঁসিও হয় অচ্যুত, লিস্ট না বেরুনো পর্যন্ত আমি চোখ . য় দেখবো না।

অচ্যুত। আচ্ছা, আমি টিপটিপি বলে আসছি। রাতারাতি র পড়ুক।

রায়। কিছু বলতে হবে না, অচ্যুত। কুলকুষ্মাণ্ড যখন দেখে ফেলেছে আমাকে, সে-ও ফাঁক খুঁজছে। সকালে উঠে আবার মুখো-মুখি দাঁড়াবে—সে সাহস ওর চোদ্দপুরুষের নেই। ...কিন্তু আসল রোগের চিকিচ্ছে কি, তাই বলো অচ্যুত।

অচ্যুত। বিয়ে দিয়ে দিন এখানে। ডাকাতি-কেসে সত্যি সত্যি

দি জড়িয়ে নেয়, মহেশ্বরবাবুই তখন ফাঁসিয়ে দেবেন।…ডাকসাইটে ঘর, তাম্বিকি চাল,—মেয়ের বাহারখানা দেখলেন তো চোখের উপর—

রায়। আমাকে সুদ্ধ থ বানিয়ে দিয়ে গেল!

অচ্যুত। তাই বলছি, দর-দামে আর কাজ নেই। টাকা তো হরদম পাচ্ছেন এটা না হয় ফসকে গেল। হাতীপোতার মেয়ে ঘরে নিয়ে তুলুন—বন্দেমাতরমের বিষ দু'দিনে ঝেড়ে দেবে।

রায়। তাই করব অচ্যুত। কিন্তু ভাবছি কি,—কোম্পানির আমল থেকে চিরকাল আমরা সাহেবের তোয়াজ করে আসছি, আমার ছেলের মাথায় এ বিষ ঢুকল কোন্ রন্ধ্রপথে?

অচ্যুত। আজকাল আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সামাল—বড্ড সামাল হয়ে চলবার দরকার, রায়সাহেব। কোন্ দিন সকালে উঠে দেখব—আপনি আমিই বা স্বদেশি হয়ে গেছি!

রায়। ভয়ের কথা হল, অচ্যুত।

মহেশ্বর প্রবেশ করলেন।

রায়। আমি মন স্থির করে ফেলেছি, বেহাই। এদ্দূর এসেছি এখন, মাকে ঘরে নিয়ে যাবই। পণ বাবদ কিন্তু একটা পয়সা দিতে পারবেন না। এই এক নিদারুণ কুপ্রথা সমাজকে বিষিয়ে দিচ্ছে। এর মূলোচ্ছেদ করতে হবে। বরঞ্চ বিনাপণে বিবাহ বলে আমার নাম উল্লেখ পাঠাবেন।

মহেশ্বর। কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ইতিমধ্যে কি হয়ে গেল—

অচ্যুত। খুলে বলছি, মশায়। রায় সাহেব আপনার মেয়েকে দেখে ফেলেছেন। দেখে বড্ড ভাল লেগেছে। আহা কি শান্ত ভবিষৎ!

রায়। একেবারে লক্ষীলক্ষণ! কোন কথা শুনব না বেহাই—

যাকে আমি চাই-ই। সাড়ে আটটার মিনিট পাঁচেক বাকি। পিসিগির নিয়ে আসুন, আশীর্বাদ করব। সাজগোজ করতে হবে না। ছেলের কাছে মা আসবেন, তার আবার সাজ কিসের? যান—নিয়ে আসুন—

মহেশ্বর তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

রায়। অচ্যুত, টের না পেয়ে যায়। তা হলে কিন্তু পিছিয়ে পড়বে। স্বদেশি করে জেলে যাবে পুলিশের পিটুনি খাবে,—এমন ছেলেকে জেনে শুনে কে মেয়ে দেবে বলো? বিয়ের তারিখও কাছাকাছি ফেলতে হবে। মুখ বন্ধ—খবরদার! আমার গুণধরের কীর্তি কাকপক্ষী না জানতে পারে।

মহেশ্বর ও অরুন্ধতী এল।

রায়। এসো এসো আমার মা-জননী। ছেলেবয়সে মা হারিয়েছি, বুড়োবয়সে আবার মা পেলাম। কিন্তু বেহাই মশায়, শুনে রাখুন আমার চুক্তি। পণ হিসাবে এক কাণাকড়ি দিয়েছেন তো আমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে। মা যাচ্ছেন নিজের বাড়ি ··অত বায়নাক্কা কিসের? শুধু শাঁখাশাড়ি—আর কিছু নয়। বুঝলেন তো?

রায়সাহেব আশীর্বাদ করতে উদ্যত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

থানা

আমিনুল ও রহিম

রহিম। ডেকে পাঠিয়েছেন কেন, দারোগা সাহেব?

আমিনুল। গহর আলির গদি লুঠ হয়েছিল, সেই সম্পর্ক—

রহিম। আমি যা জানি, সব তো আপনি লিখে সই করিয়ে নিয়েছেন।

আমিনুল। সে সব পালটে নতুন করে লিখেছি। সই করে যাও। অনেক নতুন খবর পাওয়া গেল কিনা!

রহিম। নতুন খবর?

আমিনুল। কলকাতা থেকে ঐ যে ছোকরা দুটো আসে—কি নাম ভাল—প্রবীরকুমার মিত্র আর সন্তোষ চক্রবর্তী—ওরাই হল আসল পাণ্ডা। ডাকাতির সময় ওরাও বাগদিদের সঙ্গে ছিল।

রহিম। কে বলল?

আমিনুল। বলেছে অনেকে। ভাল ভাল সাক্ষি রয়েছে। একজন হচ্ছ তুমি—ওদের চাক্ষুষ দেখেছ।

রহিম। আমি?

আমিনুল। হ্যাঁ, নিশ্চয় তুমি। এসব বড় দায়িত্বের কাজ—তোমার মতন আর কারও উপর ভরসা করা যায় না।···নাও, নাও—সই কর। রমেন রিপোর্ট নিয়ে রাত্রেই চলে যাবে।

রহিম। মতলবটা দিল কে দারোগা সাহেব? ঘোষকর্তা?

আমিনুল। তার মানে? সরকারি কাজের সঙ্গে ঘোষকর্তার কি সম্পর্ক?

রহিম। না, তাই বলছিলাম। সন্ধ্যে থেকে এই এতক্ষণ সেখানে শলা-পরামর্শ হল কিনা!

আমিনুল। ছোকরা দুটো সেখানেই আছে। পালাতে না পারে, তার বন্দোবস্ত হচ্ছিল। ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখে এলাম—

রহিম। তালা দিয়ে রেখে এসেছেন?

আমিনুল। নইলে হয়তো সরে পড়ত। সকালবেলা এ্যারেস্ট করব। ওরা স্বদেশি-দলের লোক—এস. পি. কে জানিয়ে রাখা উচিত, তাই রিপোর্ট নিয়ে রমেন এই ট্রেনে চলে যাচ্ছে। ···আসল ব্যাপারটা জান? গহর আলি খাঁটি মুসলমান—এরা তাই চক্রান্ত করে তাকে সর্বস্বান্ত করেছে। এবার এমন শাসন করে দেব, মুসলমানের উপর

হানা দিতে এ অঞ্চলে কেউ কোন দিন আর সাহস করবে না।…তুমি যদি ঠিক স্বচক্ষে না-ও দেখে থাক রহিম মিঞা, জাত-ভাইয়ের কথা বিবেচনা করে ঘটনাটা একটুখানি ঘুরিয়ে বলতে হবে।

রহিম। আমি পারব না।

আমিনুল। পারবে না, কি বল?

রহিম। হ্যাঁ ভাই—

আমিনুল। বল কি? আমি স্বজাতের জন্য এত করি, চোখের উপর দেখতে পাচ্ছ, আর তোমরা সামান্য এইটুকু—

রহিম। আপনি করেন স্বজাতের জন্য নয়—

আমিনুল। কে বলেছে? গহর আলি যদি মুসলমান না হত, খবর পেয়েই কি কেশবপুর ছুটতাম? বয়ে গেছে।

রহিম। ছুটে যান নি, প্যালকি চড়ে গিয়েছিলেন। ডাকাতে সর্বস্ব নিয়েছে; সেদিন ছেলেপুলের মুখে একমুঠো ভাত দেবার উপায় গহর আলির ছিল না, গোয়ালের গাইগরু বেচে সে আপনার পালকি-ভাড়া আর কনেস্টবলদের বার-বরদারি যোগায়।

আমিনুল। ইস, খুব যে বলে যাচ্ছ! বলাবলির সময় নেই। সই করে দাও, ব্যস!…হল কি? তোমরা যখন যে কাজে এসেছ, আমি তো কখনো ঘাড় নাড়ি নি। আজ অবধি আমার কত টাকা নিয়েছ, লেখাজোখা নেই—

রহিম। কেন থাকবে না? হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে গেছি আব্বাজানের নামে।…টাকা বুঝে নিয়ে আমার হ্যাণ্ডনোট ক'খানা ফিরিয়ে দিন।

নেকড়ায় বাঁধা একটা তাগাবের করল

আমিনুল। নোটের গোছা? বিল ভাল যাচ্ছে—পিছনে লোক

জুটেছে—উ? শশাঙ্কবাবুকে স্টেশন থেকে এনে এত নোট বকশিশ পেয়েছ নাকি?…বলি, নতুন জবানবন্দিটা শুনে নিয়ে তারপর সই করবে নাকি?

রহিম। শুনব পরে। হ্যাণ্ডনোটগুলো নিয়ে আসুন—

আমিনুল। এখন কে খোঁজাখুঁজি করে? তোমার ধর্মশাশুড়ি শুয়ে পড়েছে। কোন্ বাক্সে রেখেছে, আমি জানি নে—

রহিম। আমি জানি দারোগা সাহেব। ছিল ঘোষকর্তার বাক্সে, এখন গেছে সদরে বিনোদ উকিলের সেরেস্তায় নালিশ হবে বলে—

আমিনুল। বাজে কথা—

রহিম। হ্যাণ্ডনোট ঘোষকর্তার কাছে বিক্রি করেছেন। ওরা ডিক্রি করে ভিটেমাটি বেচে নেবে। বলুন, করেন নি বিক্রি? হক কথা তো বলে থাকেন আপনি। অস্বীকার করুন, বলুন এ ঠিক নয়—

আমিনুল। হঠাৎ টাকার বড্ড দরকার পড়ে গেল কিনা…সে এমন দরকার—

রহিম। টাকা তো ঘোষকর্তারই। আপনার হাত দিয়ে বে-নামিতে তারা কর্জ দিয়েছে আমার ঐ ভিটের লোভে। আপনি মুখে বলতেন, আমার স্বজাতি, আপনার লোক—আর তলে তলে সেই সময় ছুরি শানাচ্ছিলেন—

আমিনুল। স্বজাতি—আপনার লোক—সে কি মিথ্যে?

রহিম। মিথ্যে, ভুল। আপনার জাত আমার জাত এক নয়। সন্তোষবাবু খবরটা বলল, কিন্তু এত বড় সর্বনাশ আপনি করবেন, আমার কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিল না। এ নোটের তাড়া নয়, ছেঁড়া কাগজ। নোট কোথায় পাব? খবরটা যাচাই করতে এছেছিলাম।

আমিনুল। শোন রহিম মিঞা, শুনে যাও—

রহিম। আমার সাক্ষি মানলে ঠকে যাবেন, দারোগা সাহেব।

জাতের নামে আমাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আপনি নিজের কাজ হাসিল করতে চান। এ বজ্জাতি বড্ড পুরোণো একঘেয়ে হয়ে গেছে। নতুন কিছু বের করুন—

আমিনুল। ঘোষকর্তার সঙ্গে তোমার ঝগড়া। আবার আমার সঙ্গে ফ্যাসাদ বাধিয়ে কি সুবিধে হবে, রহিম মিঞা?

রহিম। নেবেন কি? ভিটে? ভিটের মুখে লাথি মেরে চলে যাচ্ছি। তাড়িয়ে দেবেন, সে ভয়ে নয়। তার এখনও অনেক বাকি। ভিটের ওপর থাকলে সকালে-বিকালে আপনাদের মুখ দেখতে হবে, সেই ঘেন্নায় চলে যাচ্ছি।

কয়েক পা গিয়ে রহিম আবার ফিরে দাঁড়াল।

রহিম। পিছন থেকে উস্কানি দিয়ে গোলমালের সময় আপনারা সরে পড়েন। মারা পড়ি আমরা ভেড়ার দল। বখরা নেবার বেলা আবার এসে হাজির হন। আপনাদের দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মানুষের যে এত দুঃখ, সে কেবল আপনাদের মতো মানুষ জন্মাচ্ছে বলে।

সপ্তম দৃশ্য ঘোষকর্তার ছোট বৈঠকখানা

প্রবীর ও সন্তোষ

সন্তোষ। আচ্ছা এত খাতির করে নেমন্তন্ন করবার মানেটা কি বলতে পারিস?…এ-ও এক রকমের ঘুষ। ঘুষ দিয়ে দলে টানতে চায়। হেঁ-হেঁ বাপু, আমরা আরও সেয়ানা। খাবো দাবো, আবার চামড়া ছিঁড়ে ডুগডুগি বাজাব।

প্রবীর। বকবক করিস নে সন্তোষ, ভাল লাগে না।

সন্তোষ। তুই ঝিমিয়ে পড়লি প্রবীর, বড্ড খিদে পেয়েছে?…সয়ে থাক ভাই, আর একটু সয়ে থাক। এইবার ডাকবে।

প্রবীর। তোর কেবল খাওয়ার চিন্তা।…সরে পড়তে পারলে বাঁচি। খাওয়া মাথায় উঠে গেছে।

সন্তোষ। ও কিচ্ছু না। পিত্তি পড়লে ঐ রকম মনে হয়। পাতে ভাজি পড়লে আবার দেখবি পেটের মধ্যে চনমনিয়ে উঠবে।…ও কি, ও কি? ঢেঁকুর তুলতে তুলতে যায় কারা? খাওয়া কিনিস নাকি?… হুঁ-হুঁ—'দই টকে গেছে', নিন্দে করতে করতে চলেছে।…আচ্ছা বেয়াকেলে তো? বিদেশি মানুষ আমরা, আমাদের ঘরে বসিয়ে রেখে আর সবাইকে তোয়াজ করে খাওয়ালে?

প্রবীর। কাজ নেই খেয়ে। চল্—

সন্তোষ। আহা, চটাচটি করে কি হবে? পাড়াগেঁয়ে লোক—ভদ্রতাবোধ তেমন নেই, কিন্তু খাওয়ায় ভাল হে! দেখতে পাবি পাতে বসে।

প্রবীর। চল্।… দরজা বাইরে থেকে বন্ধ যে!

সন্তোষ। শিকল দিয়ে গেছে।

প্রবীর। তুই পেটুকদাস, কেন রাজি হলি এখানে আসতে? কি মতলব কে জানে?

সন্তোষ। ও মশায়, মতলব কি আপনাদের? মশায়, ও মশায়—

প্রবীর। শুনছেন? শিকল দিয়ে গেছেন কেন?

সন্তোষ। দোর খুলে দিয়ে যান, ও মশায়।…তালা খুলছে। হুঁ—তাই। এতক্ষণে হুঁস হয়েছে। সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে এখন এসেছেন আমাদের ডাকতে!…আচ্ছা অভদ্রলোক তো আপনারা, মশাই। কুলুপ এঁটে নেমন্তন্ন খাওয়ানো—ভেবেছেন কি আপনারা?

অরুন্ধতী ও রহিম প্রবেশ করল। অরুন্ধতীর হাতে বাতি ও তালাচাবি; রহিমের হাতে বৈঠা।

অরু। যান—

সন্তোষ। কোনদিকে? আমরা তো চিনি না। আগে আগে আলো ধরে নিয়ে যান। কোনখানে জায়গা হয়েছে?

অরু। পালান—

প্রবীর। কেন, পালাতে বলছেন কেন?

অরু। এক্ষুনি। দেরি করবেন না। রহিম ঘাটে নিয়ে যাও।

রহিম। একেবারে রাণাইয়ের মোহনা পার করে দিয়ে আসব, দিদিঠাকরুণ। আমার ভয় কি? আমি কাকেও ডরাই নে। ছেলেটা মরেছে, আমরাও মরছি। এসো—এসো তোমরা—

অরুন্ধতী বাতি উঁচু করে ধরল। তিনজনে দ্রুত অদৃশ্য হল। মহেশ্বর এলেন।

মহেশ্বর। আমার দেরাজে ছিল চাবির গোছা—

অরু। আমি এনেছি। এই নাও—

মহেশ্বর। চাবি এনে ওদের সরিয়ে দিয়েছিস? দারোগাকে আমি কি বলব? ঐ, ঐ বুঝি যাচ্ছে—

অরু। না—না—

মহেশ্বর। হাত ছাড়্। দেখে আসে, আমি দেখে আসি—

অরু। না বাবা, না—

মহেশ্বর। মেয়ে হয়ে এত শত্রুতা তুই কেন করিস? দেখি আলো—ঐ যে···ঐ যেন কারা যাচ্ছে। আমি দেখে আসি—

অরু। শত্রুরা তোমায় রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে, বাবা। আমি যেতে দেবো না।

অরুন্ধতী ফুঁ দিয়ে বাতি নেভাল। নিবিড় অন্ধকার

ভাবী ধরণী

প্রথম দৃশ্য শশাঙ্কের ঘর

শশাঙ্ক বিছানায় পড়ে আছে। টিপিটিপি অরুন্ধতী এল।

শশাঙ্ক। কে?

অরু। আমি···অরুন্ধতী।

শশাঙ্ক। এসো বোন, এসো—এসো।···একটু ঘুমুচ্ছিলাম। কি করব, এত বড় জগতে এখন আমার দুটো মাত্র কাজ—অষুধ খাওয়া আর ঘুমানো। জেলের চেয়েও অবস্থা এরা ভয়ানক করে তুলেছে। মানুষ-জন আসতে দেয় না, এলেও কথা বলতে মানা। চেয়েছিলাম স্বাধীনতা, কিন্তু জীবনটা আমার শাসনে শাসনেই কেটে গেল।·· উঁহু, বিছানার উপর নয়—চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো।

অরু। আমি তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলাম, শশাঙ্ক-দা।

শশাঙ্ক। তাই তো, সাতাশে যে এসে পড়েছে! ক্যালেণ্ডারের পাতাটা ছেঁড়া হয় নি। প্রজাপতি-মার্কা চিঠি আরও খান-দুই পেয়েছি। ···গংঙ্গের ধারে ঐ বাউরিদের বাড়িতে ক'দিন ধরে খুব কাঠ চেলা করছে, উঠোনের ঘাস চেঁচে ফেলছে। বিয়ে ওদের ওখানেও। আমি জানলায় বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।·· হ্যাঁ বোন, তোমরা দল বেঁধে যেন যুক্তি করে বসেছ, সাতাশের পর বাংলাদেশে কুমার-কুমারী কেউ আর থাকবে না।

অরু। তোমাকে যেতে হবে—

শশাঙ্ক। যেতে পারি, যাবার তো লোভ ভয়ানক—কিন্তু ডাক্তারে কি বলে শোন নি বুঝি! চেহারায় জৌলুষ খুলছে আর ডাক্তার তত ভয় দেখাচ্ছে। ষড়যন্ত্র কিনা, বুঝতে পারছি নে। বলে, রাজব্যাধি—

খাইমিল। অর্থাৎ দিন ঘনিয়ে এসেছে। আরে, যদি এসেই থাকে, ক'টা দিন মনের সাধে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দাও। কোথায় যেতে হবে, সেখানে মানুষজন আছে কি না আছে—বড় ভাবনা হয়, বোন। ছোটবেলা থেকে মানুষ আমি বড্ড ভালবাসি। আর কপাল কি রকম দেখ—সেই মানুষ থেকে আলাদা করে চিরটা কাল আমায় ইটের পাঁচিলে আটকে রাখল।

অরু। বোনের কাছে ভাই যাবেই। আমি এসে তোমায় ধরে নিয়ে যাবো—

শশাঙ্ক। কিন্তু বিয়ে-বাড়ি যে! আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসবেন, তাঁদের মধ্যে—

অরু। আত্মীয়-কুটুম্বের অসুবিধে হয়, আসবেন না। তোমাকে আমি আলাদা ঘরে যত্ন করে শুইয়ে রাখব, দাদা।

শশাঙ্ক। ডাক্তারকে খোসামোদ করে দেখো, যদি ছাড়পত্র দেয়।… তাই কি দেয় রে, পাগলী? আমি এইখানে শুয়ে শুয়ে আশীর্বাদ করব। আশীর্বাদ করব তোমাদের মিলিত-জীবনকে, ভাবীকালের সন্ততিদের —যাদের জন্য নতুন পৃথিবী গড়ছি আমরা।…এসরাজটা মা আজ বের করে দিয়েছেন। কাঠের সিন্দুকের মধ্যে পড়ে ছিল। তুমি আর আমি একদিন একসঙ্গে বাজনা শিখতে শুরু করেছিলাম—সে সব মনে আছে?

অরুন্ধতী ঘাড় নাড়ল।

শশাঙ্ক। তোমার চেয়ে অনেক মিষ্টি ছিল আমার হাত। আজ ভুলে গেছি, আর বাজাতে পারি নে। তুমি পার অরুন্ধতী?

অরু। বাজাব? বাজাব শশাঙ্ক-দা?

শশাঙ্ক। দেখ তো বাজে কিনা।

অরুন্ধতী বাজাতে লাগল।

শশাঙ্ক। আঃ, এত সুন্দর পৃথিবী! বেশ বাজাও তুমি। বাঃ। আমার কিছু হল না।...মনে পড়ে অরু, শাপলা তুলতে গিয়ে ডোঙ্গা ডুবল বিলের মধ্যে, কাদা মেখে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরলাম?...সেই পাঠশালে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শতকে পড়া?...কলার খোলার পালকিতে পুতুল শ্বশুরবাড়ি পাঠানো?...বাবা চড় মেরে আবার চুমু খেলেন একদিন...বাঁশবনে গেলে বড্ড ভয় করত, মনে হত ভূত-প্রেত যক্ষ-রক্ষ ভয় দিচ্ছে।...একদিন একটা হলদে-পাখী উড়ে এসেছিল ঘরে।...বাজাও, তুমি বাজাও—

অরুন্ধতী বাজাচ্ছে। শশাঙ্ক ঘুমিয়ে পড়ল। অরুন্ধতী এসরাজ রেখে উঠে দাঁড়াল। মা টিপি-টিপি এলেন।

মা। ঘুমিয়েছে?

অরু। হ্যাঁ মা, দুরন্তপনার পর ছোট ছেলে যেমন ক্লান্ত হয়ে ঘুমোয়—

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

অরু। মা, মাগো, কি হয়ে গেছে শশাঙ্ক-দা! মানুষ তো নয়—মোম দিয়ে গড়া পুতুল।

মা। প্রায়শ্চিত্ত অরুন্ধতী, মহাপাপের মহা-প্রায়শ্চিত্ত। একদিন বড় পাপ করেছিল এই দেশের মানুষ—ঝগড়া করে দেশটা পরের হাতে তুলে দিয়েছিল। শশাঙ্করা প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

অরু। ডাক্তারে কি বলছে, সত্যিই—

মা। তার জন্য আমি তৈরি রয়েছি, মা। মনে করব, শশাঙ্ক আমার অনেক—অনেক দিনের জন্য দ্বীপান্তরে গেছে। বাড়ির আশে পাশে দারিদ্র্য আর অত্যাচার-অনাচারে ম্যালেরিয়ায় ভুগতে ভুগতে শশাঙ্কের মতোই হাজারে হাজারে চোখ বুঁজছে, এ কিছু নতুন ব্যাপার নয়। তাদের মা সান্ত্বনা পাচ্ছে অরুন্ধতী, আমিও পারো—

দ্বিতীয় দৃশ্য কান্তরামের বাড়ি

ঝাঁপ-আটা ঘর। কান্তরাম দাওয়ার উপর বসে তার-স্বরে গান ধরেছে—

চেঙা কয়, ও বেঙা ভাই—
রেতের বেলা খাবি কি ?
হাঁড়ি খানেক পান্তাভাতে
কলসি খানেক গাওয়া ঘি।

কলসি কাঁখে যামিনী ঘাট থেকে এল।

যামিনী। ছোট পিসি, ও ছোট পিসি—

কান্ত। কি, আবার ছোট পিসিকে কেন ?

কলসি নামিয়ে যামিনী ডাক ছাড়ছে।

যামিনী। ও পিসি, গেলে কোথা ? জবাব দাও না কেন ?

[নেপথ্যে কান্ত। আমি রান্নাঘরে।]

যামিনী। বাবার চাল নিও না আজ—

কান্ত। চাল নেবে না ? কেন, হয়েছে কি ?

যামিনী। জ্বর হয়েছে।

কান্ত। ওঃ ধন্বন্তরী ঠাকরুণ এলেন আর কি ! জ্বর এলেই হল ? নাড়ি দেখেছিস ?

যামিনী। দেখতে হবে কেন—শুনছি তো। গলা কাঁপিয়ে গান ধরেছ, আর জ্বর হয় নি ?

কান্ত। গান ধরলেই জ্বর আসে ? বেশ বুদ্ধি ! ঘোষকর্তা সেকালে আসর করতেন, বাইজিরা রাত দুপুর অবধি গান গাইত। তারা সব জ্বরো রুগী—না।

যামিনী কথা না বলে চাল বাছিল।

কান্ত। কোথা চললি? শুনে যা, একটা কথা শুনে যা—

যামিনী। কি কথা? সাঁঝ হয়ে এল, গোয়ালে সাঁজাল দেব। অনেক কাজ। কথা শুনবার সময় আছে?

কান্ত। শুনে যা, লক্ষ্মী মা আমার—

যামিনী। কি শুনব? জর না হয় তো শুয়ে আছ কেন বিকাল-বেলা? এসো না উঠে।

কান্ত। নবাবের বেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম ঝাড়ছেন—'এসো না উঠে!' মুখের কথায় তো খাজনা দিতে হয় না! কি রকম শীত পড়েছে আজ—ওঠা অমনি সহজ কিনা!

যামিনী। শীত না হাতী। এখনো পৌষমাস পড়ে নি। আমার গায়ে তো এই একটু আঁচল—

কান্ত। তর্কবাগীশ, তর্ক করিস নে। আসবি কিনা তাই বল্।... গায়ে জুত থাকলে সবাই দেমাক করে আঁচল উড়িয়ে বেড়ায়।...কাঁথা-মাদুর সব কি পুড়িয়ে খেয়েছিস, হারামজাদি? চাপা দিয়ে যা, চাপা দিয়ে যা। উঃ উঃ উঃ—আরও—আরও আন্—বালিশ দে, পাশ-বালিশ দে, নিজে চেপে বোস দেখি ওর উপর—

চেঙা কয়, ও বেঙা ভাই—
চাইয়া চাইয়া দেখিস কি?
চারডেখানি সরবে নাই যে অম্বলে
সম্বরা দি।

কান্ত প্রবেশ করল।

কান্ত। ডাকছিলি কেন রে?...ও কি?

যামিনী। বাবার জর হয়েছে। ম্যালেরিয়া—

কান্ত। ম্যালেরিয়া জানলি কি করে?

যামিনী। ঐ যে অম্বলে সম্বরা দিচ্ছে। ও অরে অম্বল খেতে ইচ্ছে করে বড্ড। আজ বাবার চাল নিও না—

ক্ষান্ত। চাল কারোই নেবে না। নিতে হবে না।

কান্ত। কেন? কারোই নিতে হবে না কি জন্যে? জ্বর সবারই হল নাকি?

যামিনী। চাল বাড়ন্ত।

ক্ষান্ত। এককণা ক্ষুদ নেই কলসিতে। ও-বেলা চেয়ে চিন্তে চালিয়েছি, এ বেলা পারব না। কারো বাড়ি চাইতে যেতে পারব না আমি।

কান্ত। চাইতে তুমি কেন যাবে ক্ষান্ত? ধানের পালায় পালায় খামার-বাড়িতে আমার পা ফেলবার জায়গা নেই, ধান খেয়ে খেয়ে নেংটি ইঁদুরগুলো মুটিয়ে হাতী হয়ে গেল, আর আমার ঘরে চাল বাড়ন্ত? তোমরা গতর নাড়াতে চাও না, তাই বলো। নইলে এক আঁটি ধান ঝেড়ে নিলে তো দু-দিনের খোরাক।···কে? কে আসে? ··ওঃ! মরে গেলাম—জ্বলে গেল উ-হু-হু—

বিশু বরকন্দাজ এল। তাকে দেখে কান্তরাম কাতরাতে লাগল। ক্ষান্ত চলে গেল।

বিশু। আমি বিশ্বম্ভর।···কি হল তোমার?

কান্ত। উ-হু-হু, মরে যাচ্ছি, খুড়ো। জ্বরবিকার—দেখসে উঠে।··· তারপর, বৃত্তান্ত কি? খুকি-দিদির বিয়ে, আর তুমি গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

বিশু। হুঁ, ঘুরে বেড়াব! তা হলে হয়েছে আর কি! তোমার খামার-বাড়িতে ধানের আঁটি গুণতে এসেছিলাম।

কান্ত উত্তেজনায় উঠে বসল।

কান্ত। ঘর-দোর ছেড়ে কি পালিয়ে যাচ্ছি খুড়ো, তাই ধান না উঠতে সাত তাড়াতাড়ি আঁটি গুণতে এসেছ? নিজের লাঙলে নিজে মেহনত করে আনা ধান···ছ'আঁটি ভেনে কুটে খাই-ই যদি—

বিশু। না, একচিটেও নড়বে না খামার থেকে। ক্রোক হয়ে গেছে, জান না? খোদ ঘোষকর্তার হুকুম—চোখ রাঙাচ্ছ তুমি কার উপর, মোড়ল?

কান্ত। (যেন আগুনে জল পড়ল) এই দেখ, চোখ রাঙানো আবার কোনখানে দেখলে? চোখ-রাঙা কেবল বুঝি রাগে হয়? তাই শুধু তোমরা জেনে বসে আছ। কান্নাতেও রাঙা হয়, খুড়ো।··· বাবুর কাছে এ সব আবার লাগিও না। মানে—আমি যা বলছিলাম, খুব ঠাণ্ডা হয়েই বলছিলাম। জ্বরবিকার কিনা—গলার আওয়াজের হেরফের হয়ে যায়।

বিশু। জ্বরবিকার? বাগদা-চিংড়ির মতো ছটাং করে ছিটকে উঠলে—ওরে আমার জ্বরবিকার রে!

কান্ত। গরিব চাষাভুষো আমরা—যে দিন শ্মশানঘাটায় নিয়ে যাবে, সেদিনও ছটাং করে চিতেয় লাফিয়ে পড়ব।·· বিবেচনা করো খুড়ো, আমার তো এই অসুখ—আঁটি গোনাগাঁথা করবে কে? তাই বুঝিয়ে বলো গে। কালকে—কাল সকালে এসো—

বিশু। গোনা সারা হয়ে গেছে, কান্তরাম। বিকেল থেকে কি এতক্ষণ কেষ্টমন্ত্র জপ করছিলাম? পাঁচ হাজার তিনশো ছয় আঁটি। পাঁচ তিন শক্তি ছয়—

কান্ত। খুচরো ঐ ছয়টা বাদ দিয়ে দাও, খুড়ো। [বিশুর হাত জড়িয়ে ধরল] রসুই-বাস বন্ধ আজকে—

বিশু। উঁহু, সে কি করে হবে? গুণে পাচ্ছি, পাঁচ হাজার তিনশো ছয়—

যামিনী। তুমি কমিয়ে বোলো—

কান্ত। পুরোপুরি পাঁচ হাজার তিনশো লিখিয়ে দাও গে, মাণিক আমার—

বিশু। ছ' আঁটি—বাপ রে বাপ!…আচ্ছা, আঁটির রেট কিন্তু দু'—দু' আনা।

কান্ত। তাই দেবো। ছ-আঁটির দরুণ ছয় দুনো বারো আনাই দিয়ে দেবো তোমায়।

বিশু। দাও। আমার নগদ কারবার।

কান্ত। আজকে নয়, পরশু। হাটে দিয়ে দেবো। মাইরি। তবিলে আজ ফুলোডুমুর। একটা পয়সা থাকে তো সে বাপের হাড়।

বিশু। তবে হবে না। মনিবের নুন খেয়ে নিমকহারামি করব, আমার পরকালের ভয় নেই? পাঁচ হাজার তিনশো ছয়—পাঁচ তিনশক্তি ছয়…পাঁচ তিন— বিশু চলে গেল।

কান্ত। শালা! আঁটি গুণে গেলেন, সাত পুরুষের সম্বন্ধী আমার! 'আমরা দেবো জান—কাগে খাবে ধান—'

যামিনী। চুপ—চুপ—

কান্ত। কেন চুপ করব? তোদের মতো মেয়েমানুষ নাকি? কারে পরোয়া করি? আঁটি গুণে গিয়েছে তো ভারি করেছে—ওজন করে যায় নি তো! আমি আঁটি খুলে ফেলব। গোছা গোছা সরিয়ে নিয়ে গুণতিতে আবার ঠিক ভজিয়ে রেখে দেব।…ছ'টা আঁটি চেয়েছিলাম,—প্রাণ দিয়ে তা-ও সরল না,—ছ'কুড়ি চালান করে দেব। কি করবি,—জিজ্ঞাসা করি, কি করবি তোরা তখন?

যামিনী। চুরি করবে?

কান্ত। চুরি—কিসের চুরি? নিজের জমির ধান—বেচবো না, বিলোবো না—শুধু পেটের খোরাকিটা। 'কাগে খাবে ধান—আর আমরা দেবো জ্ঞান!' চুরি অমনি বললেই হল

কান্তরাম উঠে টলতে টলতে দাওয়া থেকে নামল। হঠাৎ সে পড়ে গেল। যামিনী চেঁচিয়ে উঠল। ক্ষান্ত ছুটে এল।

যামিনী। ওকি! বাবা ..পিসি, ছুটে এসো ছোট পিসি—

ক্ষান্ত। কি?

যামিনী। ভিরমি লেগে পড়ে গেছে, বাবা। জল আনো।...পাখা কই?...ও বাবা, বাবা গো, কথা বলো।...বাতাস করো পিসি, জোরে বাতাস করো—

কান্ত। 'কাগে খাবে ধান, আমরা দেবো জ্ঞান!'

যামিনী। ও বাবা, কি বলছ?...চোখ মেলো...আমি তোমার যামিনী—

হলধর ও বিশু বরকন্দাজ

হল। কি—চেঁচামেচি কিসের?

যামিনী। বাবার কি হয়েছে, দেখ—গোমস্তা মশাই। ওঠে না, চোখ মেলে না, ডাকলে সাড়াশব্দ দেয় না—

হল। ও রোগ আমার ঢের দেখা আছে, বাপু। কাছারির লোক দেখলে চোখ উলটে পড়ে। আমি ওঠাচ্ছি, ভাল চিকিচ্ছে জানি আমি। ভরকুটি বড্ড বেড়েছে।

হাতের লাঠি দিয়ে কান্তরামকে গুঁতো দিল।

হল। ওরে নচ্ছার হারামজাদা বেটা, গায়ে ছাই-চাপা দিলে যমে শুনবে না। বাপের সুপুত্তর হয়ে এক্ষুনি পাঁচশ' কলাপাতা কেটে দিতে হবে।...শুনছিস, ওরে কান্তরাম?...ভাল ফ্যাসাদ বাধিয়েছে রে

বিশে। সন্ধ্যের সময় ভাঁড়ারির এখন হুঁস হল যে, কলাপাতা কম পড়ে যাবে। সবাই সারাদিন খেটেখুটে বাড়ি গেছে—কাকে বলি এখন?

হলধর বিশুর কানের কাছে মুখ আনল।

হল। (ফিসফিস করে) গতিক ভাল নয়, বিশে। চোখ জবাফুলের মতো, বিড়-বিড় করে ভুল বকছে। মরবে নাকি রে, বেটা?

বিশু। তাই তো!

হল। খামার-ভরা ধান পড়ে রইল, মলা-ডলা কিছু হয়নি। বেটা মরলে যে সর্বনাশ!

হলধর ও বিশু দ্রুত চলে গেল। যামিনী তখন অচেতন কাতরামের উপর ঝুঁকে কাতরকণ্ঠে ডাকছে।

যামিনী। বাবা, ও বাবা, কথা বলো। চিনতে পারছ? আমি তোমার যামিনী—

তৃতীয় দৃশ্য — ঘোষকর্তার বাড়ির ফটক, উঠোনের খানিকটা ও বারান্দা

রসুনচৌকি বাজছে। ফটকে দাঁড়িয়ে মহেশ্বর ও আর কয়েকটি ভদ্রলোক বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করছেন। আতর ছিটানো হচ্ছে। অভ্যাগতদের গলায় বেলফুলের মালা দেওয়া হচ্ছে। কিছুদূর থেকে একটা ভিখারির গলা শোনা যাচ্ছে—'একটা পয়সা।' 'ঈশ্বর মঙ্গল করবেন, বাবা।' 'রাজাবাবু দিয়ে দাও একটা পয়সা।'

মোটরের আওয়াজ। বরের সাজে প্রবীর এবং তার সঙ্গে কয়েকজন এল। কন্যাযাত্রীরা শশব্যস্ত হয়ে তাদের ভিতরে নিয়ে গেল। শঙ্খ ও উলুধ্বনি হচ্ছে। খই ছড়ানো হল। এদের পরে এলেন রায়সাহেব।

মহেশ্বর। আসুন, আসুন···আসতে আজ্ঞা হয় বেহাই মশায়—

একটা ভিখারি-মেয়ে রাস্তার দিক দিয়ে এল

মেয়ে। একটা পয়সা হুজুর।

মহেশ্বর। (মুখ ভেংচে) পয়সা! দানসত্র খোলা হয়েছে—না? আরে, কে আছিস—দূর করে দে তো এটাকে।···এই কনেস্টবল, কেয়া করতা তোম? উধারমে চিল্লাতা হায়, কান ঝালাপালা হো গিয়া—দুঠো রদ্দা মারকে সব ঠাণ্ডা করকে দেও।···বেহাই মশায়কে দোতলায় নিয়ে যা। যান—বসে ঠাণ্ডা হোন গে।···আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়। ···আবার এসেছে খোঁড়াটা? মার্—মার্—

এক খোঁড়া-ভিখারি এদিকে এগোচ্ছিল। গতিক দেখে সে পালাল।

মহেশ্বর। ওরে, আমার জন্য লেমন-স্কোয়াশ আনো একটা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

হলধর এল।

মহেশ্বর। এতক্ষণে ফিরলে হলধর? চোর-কুঠুরির চাবি পাওয়া যাচ্ছিল না—দুটো ঝাড়-লণ্ঠন তার মধ্যে—

হল। কলাপাতা গুণতিতে কম হয়ে গেল, আমি পাতা কাটাবার তাগাদায় গিয়েছিলাম মোড়লপাড়া।···দেখে এলাম, কাশুরামের বড্ড অসুখ। অবস্থা খুব খারাপ।

মহেশ্বর। খারাপ মানে?

হল। আজ্ঞে, সুবিধের নয়। চোখ টকটকে লাল। প্রলাপ বকছে।

মহেশ্বর। বেটা মরবে নাকি?

হল। তা মরতে পারে। যে রকম ক্যাপফ্যাল করে তাকাচ্ছিল, দেখলে ভয় করে।

মহেশ্বর। সাড়ে পাঁচশ'র ডিক্রি রয়েছে—একটা-দুটো টাকা নয়। দেনাপত্তোর করে এই খরচ করছি, বেটা মরলে আমাকেও মেরে রেখে যাবে।

হল। আজ্ঞে, সত্যি কথা। ক্রোক-করা ধান খামারে পড়ে রয়েছে। বিশে আজ বিকেলে কেবল আঁটিগুলো গুণে এসেছে।… আর দেরি করব না। কাল সকালেই মদন মণ্ডল ধান মেপে নিয়ে আসি। যদ্দুর পারা যায় উশুল হোক।

মহেশ্বর। সকালে কেন? একুনি চলে যাও। তুমি আর বিশু —একুনি—একুনি—

হল। আজ্ঞে, বাড়িতে একটা যজ্ঞি—

মহেশ্বর। আর, রাতের মধ্যে যদি চোখ উলটে পড়ে—তখন? তখনকার উপায় কি বলো। কিছু বিশ্বাস নেই—বেটারা সব পারে। তখন ওয়ারেণ্ট-কায়েম করো, হেনো করো, তেনো করো—বিশ হাত জলের নিচে পড়ে যাবো। বাড়ির যজ্ঞি পালাচ্ছে না। কাজ চাই সকলের আগে।

হল। তা তো বটেই। তা হলে আমি বরং একটু দই-সন্দেশ মুখে দিয়ে—

মহেশ্বর। উঁহু। সন্দেশ-লুচি-পোলাও তোলা থাকবে, হলধর। তুমি এখুনি চলে যাও—

হল। আজ্ঞে?

মহেশ্বর। যাও যাও—তিলার্ধ দেরি নয়।…আসুন, আসুন এই পথে—

হলধর বিরসমুখে চলে গেল। একটু পরে সরকার একজনকে টানিতে টানতে নিয়ে এল।

সরকার। হুজুর, এই একটা ঢুকে পড়েছে খিড়কির বাগানে।

মহেশ্বর। ঢোকে কি করে? তোমরা সব কি করো শুনি? দরজা দেওয়া থাকে না?

সরকার। দরজা দেওয়াই ছিল। হারামজাদা পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়েছে। পড়েছিল খোয়ার উপর, কনুয়ের এক বিঘত চিরে গেছে।

মহেশ্বর। বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। এর উপর চটাপট ঘা লাগাও তো কতকগুলো। শিক্ষা হয়ে যাক।

লোকটা। তিনদিন খাই নি কর্তা। বড্ড বাস বেরিয়েছিল, থাকতে নারলাম।

মহেশ্বর। কি বলে?

সরকার। কালিয়াটা তোকা পাক হয়েছে কি না! বলছে, গন্ধে পাগল হয়ে লাফ দিয়েছে।

মহেশ্বর। ঘাড় ধরে আবি নিকাল দেও।···আসুন দে-মশায়, আসতে আজ্ঞা হোক। এত দেরি করে ফেললেন—

আগন্তুকের সঙ্গে মহেশ্বর একটু এগিয়ে গেলেন।

সরকার। যা—যা—পালা—

এক পাইক এসে ধাক্কা দিল লোকটাকে। লোকটা ধাক্কা খাচ্ছে, তবু নিচু হয়ে খই খুঁটছে।

সরকার। কি ওখানে?

পাইক। খই খুঁটে নিচ্ছে। জামাই এলে সেই যে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

লোকটা। মেরো না, বাবা। তোমরা তো ছড়িয়ে দিয়েছ, ধুলো-বালিতে পড়ে আছে। তিনদিন খাই নি, দুটোখানি খুঁটে নিচ্ছি, বাবা—

পাইক ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে বের করে দিল।

ঘরের ঝাঁপ সামান্য খোলা। উঠানে হলধর ও বিশু বরকন্দাজ।

হল। কেমন? এখন আছে কি রকম?···বড্ড উতলা হয়ে আছি। ডাকলে সাড়া-টাড়া দিচ্ছে?

[ঘরের ভিতর থেকে যামিনী ' একটু ভাল। বাবা!]

যামিনী ঝাঁপ খুলে দিল। ঘরের ভিতরটা উন্মুক্ত হয়ে গেল।

কান্ত। উঁ—

যামিনী। ডাকলে সাড়া দেয়। কিন্তু চোখ মেলছে না।

হল। মেলবে···ঠিক মেলবে। রাত্তির বেলা—জ্বরের সঙ্গে ঘুমের আবিল এসেছে কি না! সকাল হলে উঠে বসবে। কোন ভয় নেই। ···ও কান্তরাম, আমরা দু'জন—শ্রীহলধর শিকদার ও শ্রীবিশ্বম্ভর পরামাণিক খোদ কর্তামশাইর হুকুম মতে তোর খামারের ক্রোক-করা ধান মলতে এসেছি। সকলের সামনে প্রকাশ্যভাবে ষোল আনা আইন-মাফিক করছি।···বুঝলি রে বাপু, বুঝতে পারলি? 'হ্যাঁ' বল্।···কি বলছিস, বুঝতে পারছি না—একটু স্পষ্ট করে বল্—

বিশু। বলছিস কি রে, ও কান্ত? ভাল করে বল্।···বিড়-বিড় করে কি বলছিস, বোঝা যাচ্ছে না।

কান্ত। 'আমরা-জিলাম জান, কাগে খায় ধান'—

হল। কেন কাকে খাবে? সরকারের গোলায় আমানত থাকবে। এক ছিটেও লোকসান হবে না। হিসেব করে পাই-পয়সা অবধি মিটিয়ে

উশুল দিয়ে দেব। তুই কষ্ট করে রুয়েছিস, কেটেছিস, খামারে এনে তুলেছিস—নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাক্ বাপু, কোন গোলমাল হবে না। (ফিস-ফিস করে বিশু বরকন্দাজকে) গতিক ভাল ঠেকছে না, বিশে। তাড়াতাড়ি কর্। ও রকম বরপাত্তোর হয়ে থাকলে চলবে না। নাগরা খোল্—কোমর বাঁধ্। কাছারির খোলস রেখে দে এখন। চাষার ছেলে তো বটে! গোরু এনে জুড়ে দে শিগগির।...দেখ যদি কাজকর্ম সারা করে বড়-ভোজের আগে গিয়ে পৌঁছুতে পারি!... আমি এই বসলাম এখানে।

হলধর দাওয়ায় জলচৌকির উপর বসে পড়ল।

হল। তুই জোগাড় দেখ। ...কলকেটায় আগুন এনে দিয়ে যা দিকি ভিতর থেকে—

বিশু। ভিতরে আগুন কোথা?

হল। রান্নাবান্না করছে—

ক্ষান্ত প্রবেশ করল। সে তামাক এবং হাতায় করে আগুন এনেছে।

ক্ষান্ত। রান্না করব, তার চাল কোথা? উঠান-ভরা ধানের গাদা ঘরের মধ্যে চাল বাড়ন্ত। ...এই নাও তামাক আর আগুন; গোমস্তা মশায়ের তামাকের যোগাড় করে রাখও। উনুন তো ধরিয়েছি বিশু খুড়ো, আমরা কি করব এখন?

হল। বাঃ বাঃ—ভাল-মানুষের মেয়ে—আক্কেল-বিবেচনা আছে। শীতের রাতে বুড়ো মানুষটা এসে বসল, তাড়াতাড়ি সব যোগাড়-যন্তোর করে নিয়ে এসেছে।

ক্ষান্ত। তা নায়েব মশায়, তোমরাও বিবেচনা কর একটু। খেটে খেটেই তো দাদার ঐ দশা! সমস্ত ধান কি নিয়ে যাবে তোমরা? তা হলে আমরা বাঁচব কি খেয়ে? পেটের খোরাকিটাও দেবে না?

হল। দেব, দেওয়া হবে বই কি মা! মনিবের পাওনা-গণ্ডা—তার উপর বাকতীর আমলান-খরচা হিসেবপত্র করে নিয়ে যা থাকবে সমস্ত তোমাদের—

ক্ষান্ত। কিন্তু আজ—

হল। দেখা যাক হিসেবপত্র করে—

বিশু। কেন মিথ্যে আশায় ভোলাচ্ছ গোমস্তা মশায়? বাড়তি এক ছিটেও হবে না—তুমি জানো, আমিও জানি।

ক্ষান্ত। হয় দিও, না হয় না দিও। এখন এই এত ক'টি ধান দাও, গোমস্তা মশায়। উনুন ধরিয়েছি, আমরা খই ভেজে খাব। দাদা সকাল থেকে খায় নি, পেটে পড়লে হয়তো একটু চাঙ্গা হবে, তাকে চাট্টি দেব।...এত বড় শীতের রাত ছোট মেয়ে যামিনী নিরম্বু থাকবে কেমন করে? ...কথা বলছ না যে! দুই মুঠো ধান গোমস্তা মশায়, এই রকম দুইটা মুঠো ধান। আমাদের ক্ষেতে-আর্জানো দাদার গতর-ঘামানো ধান—তার এই এত ক'টি। ...এই পা জড়িয়ে ধরলাম। বলো, দেবে তো?

হল। দেখ, দেখ—দিল অবেলায় ছুঁয়ে। নেয়ে মরতে হবে রেতের বেলায়।

হলধর পা ঝাড়া দিল। ক্ষান্ত ছিটকে গিয়ে পড়ল।

হল। ভেঁপো মাগী, মর্দানি করতে এসেছে! ভাইকে বলিস, সেরে-সুরে কাছারি যেতে। হিসেবপত্র হয়ে যাক। আগে ভাগে তুই এর মধ্যে কথা বলতে আসিস কেন শুনি? বিষয়-আশয়ের ব্যাপার—তুই এর কি বুঝিস রে হারামজাদি?

ক্ষান্ত। বুঝি নে গোমস্তা মশায়, বুঝতে পারি নে। ধান হল, ধান তুলে নিয়ে এল বাড়ির উপর—কেন তার ভাত আমাদের মুখে উঠবে না? কেন? কেন?

হল। বুঝবি কি করে? একে মেয়েমানুষ, তায় মুখ্যু।...চল্ রেঃ বিশে, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মলন জুড়ে দিয়ে আসব।

হলধর ও বিশু বেরিয়ে গেল; ক্ষান্ত ছুটে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, যামিনী এল।

যামিনী। কোথায় যাচ্ছ, পিসি?

ক্ষান্ত। উনুনে জল ঢালতে—

হঠাৎ দেখা গেল কান্তরাম টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে।

যামিনী। একি? .. বাবা! উঠলে কেন? টলছ—আবার পড়ে যাবে। সর্বনাশ, তুমি শোওগে—শোওগে—

কান্ত। দিল না? পায়ে ধরে কেঁদে পড়ল, তবু দয়া করল না? ঠাকুর, এই তোমার রাজত্ব? তুমি জেগে আছ, না ঘুমুচ্ছ ঠাকুর?

যামিনী। (কান্তকে ধরল) চলো বাবা, তুমি শোবে চলো।--

কান্ত। যামিনা, যেতে পারিস একবার শশাঙ্ক-ভাইয়ের কাছে? তাকে মেরেছিলাম এই এত বড় এক ঢিল। মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তো মারি নি। শয়তানেরা মেরেছিল আমার এই হাতখানা দিয়ে।...তুই একবার যা। তার চেয়ে বেশি আইন তো কেউ পড়ে নি। তাকে জিজ্ঞাসা করে আয়, সকলের বড়ো যে আদালত, তার আইনে কি বলে?

যামিনীর গায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়াল।

বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, তার আয়োজন দেখা যাচ্ছে; আমিনা ঘরের মধ্যে, উঠানে রহিম। মাঝে মাঝে ঘোষকর্তার বাড়ি থেকে রসুনচৌকির আওয়াজ আসছে।

রহিম। কই, বড্ড যে দেরি করে ফেলছিস বউ—

আমিনা বেরিয়ে এল। তার হাতে বোঁচকা।

আমিনা। দেরি তো হবেই। সমস্ত বেঁধে-ছেঁদে নিতে হল।

রহিম। সমস্ত মানে তো ঐ খান দুই ভাঙা কাঁসি আর খান কতক কাঁথা-কাপড়। সুবিধা আছে। আমাদের সর্বস্ব নিয়ে যেতে হাঙ্গামা করতে হয় না।…দে, ওটা আমায় দে—

আমিনা। শোন, কথা রাখ।…এখনো বলছি, যেয়ে কাজ নেই।

রহিম। থাকি কেমন করে? ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। এদিকে ঘোষকর্তা—প্রজার দরদে চোখে বান ডেকে যায়, কিছু করতে পারেন না বলে কত আফশোষ! আর ওদিকে আমিনুল হক—হক-কথা ছাড়া বলেন না, জাত-ভাই পেলে কাঁধে তুলে নাচান!…বউ, যাচ্ছি কি সাধ করে? যেতে কি মন চায়? এই রকম চলে যাব বলে কি নতুন করে ঘর ছেয়েছিলাম? রইল সাধের ঘর, রইল তিন পুরুষের ভিটে—

আমিনা। আর ঐ জামতলায় পড়ে রইল আমার খোকা।… ওগো আমি যাব না। আজ দু'বছর খোকার কবর আমি চোখে চোখে রাখছি—ওকে ফেলে যেতে আমি পারব না। পা জড়িয়ে ধরে আমি ঘোষকর্তা আর দারোগাকে ঠাণ্ডা করব।

রহিম। না বউ, আমার ইজ্জত আছে। ওদের মুখ দেখলে পাপ হয়—বরং চাইতে তোকে আমি যেতে দেব? কেরো বিদের মতো ওরা—কাছে এলে এখন গা শির-শির করে ওঠে। তাই তো চলে

অন্ধকার। মানুষ দেখা যাচ্ছে না, শুধু কলকের আগুন। ফড়-ফড় করে হুঁকো টানার শব্দ শোনা যায়। আলো জ্বললে দেখি, হলধর কান্তরামের দাওয়ায় জলচৌকির উপর খুঁটি ঠেশ দিয়ে ঝিমোচ্ছে। কলকের আগুন পড়ে গেল উঠানে।

বিশু বরকন্দাজ এল।

বিশু। গোমস্তামশায়, গোমস্তামশায়—

হল। কি রে বেটা?…উঃ, আগুন ছড়িয়ে নৈরেকার!

বিশু। খুঁটি ঠেসান দিয়ে ঐ রকম ঘুমোয়? এক্ষুনি যে পড়ে যাচ্ছিলে ঘুমের ঝোঁকে।

হল। ঘুম দেখলি কোথা? চোখ বুঁজে বুঁজে ভাবছিলাম। বাবুর বাড়ি এখন হৈ-হল্লা চলেছে। কত খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-স্ফূর্তি! আর আমরা এখানে শীতের মধ্যে হি-হি করে মরছি।…বাবুর বিবেচনাটা দেখ, বিশ্বম্ভর। এই একটা রাত্তির—তা-ও ঐ গোরুর মতো আমাদের জোয়ালে জুতে দিয়েছে।

বিশু। তা গোরু বই কি! ওদের হল কাজ নিয়ে কথা। গোরুতে পেরে না উঠলে বেচে দেয়। আমরাও যখন আর পেরে উঠব না, ঝেঁটিয়ে দূর করে দেবে।

হল। আরে, গোরুগুলো কি ঝিমিয়ে পড়ল রে? চুপচাপ দাঁড়িয়ে, নড়াচড়া নেই—

বিশু। মুখের ঠুশি খুলে একটুখানি বেঁধে দিলাম ঐ জায়গায়। চাটি পোয়াল খেয়ে নিচ্ছে।

হল। তা বেশ করেছিস। সেই সন্ধ্যে থেকে খাটছে, শেষকালে গোমন্তি লাগবে ? বেশ হয়েছে। বেশ, বেশ—

বিশু। কিন্তু মানুষের শাপমন্তি যে লাগছে গোমস্তামশায়—

হল। মানুষের ? মানুষ আবার কে শাপ-শাপান্ত করতে আসবে এই নিশি-রাত্রে? হাতীপোতা এখনো মরে যায় নি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা—

বিশু। মুখ ফুটে না করলেও মনে মনে করছে। ···আচ্ছা গোমস্তা মশায়, খুঁটিখানেক ধান এদের দিলে কি ক্ষতি হয় ? ওর কি কোন হিসেব হবে ?

হল। খবরদার বিশে, খবরদার ! দেয়ালেরও কান আছে। এখুনি পাঁচ শালা গিয়ে কর্তার কান ভাঙাবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বিশু। কিন্তু গোরুগুলো তো ঐ খাচ্ছে কর্তার পোয়াল।

[নেপথ্যে ক্ষান্ত। গোরুর চেয়েও আমরা হতভাগা—]

হল। (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) বলি দয়ার সাগর বিদ্যেসাগর হয়ে উঠেছিস তো শকুনির মতো জমিদারের উচ্ছিষ্ট খেঁটে বেড়াস কেন ? নিজের চরকায় তেল দিগে যা ; আর মহাত্মাগিরি ফলাতে হবে না। ··চল্ চল্— দেখা যাক কতটা বাকি।

কয়েক পা এগিয়ে হলধর থমকে দাঁড়াল ।

হল। হ্যাঁরে গোরু ক'টা—চারটে না ?

বিশু। চারটেই তো—

হল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—ঐ যে পাঁচটা। পাঁচটা জুটল কোত্থেকে ?

বিশু। তাই তো—পাঁচটাই তো। পোয়াল খাবার লোভে কাদের গোয়ালের গোরু দড়ি ছিঁড়ে এসে জুটেছে।

হল। শয়তানি দেখ। আচ্ছা করে তুলো ধুনে দিয়ে আয়। ভাত থাকলেই কি যত কাক এসে জুটবে? মানুষ বলো, গরু বলো—সব ঐ এক রীত?

বিশে চলে গেল। আবার তখনই ফিরে এল।

বিশু। (ফিস-ফিস করে) গোরু নয়, চোর—

হল। চোর?

বিশু। হ্যাঁ, মানুষ গোরু সেজে রয়েছে। কাপড় জড়িয়ে চারটে গোরুর মাঝখানে দু-হাত দু-পা মেলে গোরু হয়েছে, পোয়ালের নিচে থেকে দোদার ধান বস্তায় পুরছে। বেড় দিয়ে ধরে ফেলতে হবে, আমি তাই ঘাঁটা দিই নি।

হল। দিস নি তো? বেশ করেছিস, বুদ্ধির কাজ করেছিস—

বিশু। তা তুমি আস্তে আস্তে সরে পড়ছ নাকি, গোমস্তা মশায়?

হল। সরে পড়ব মানে? মানুষ-জন ডেকে নিয়ে আসি। একজনে দু'জনে গোয়াতুর্মি করা ঠিক নয়।

বিশু। চোর তো একটা...আমরা তবু দু'জন—

হল। একটা ঐ সামনে। আশেপাশে কত জন আছে ঠিক কি? ওরা একা আসে না।...যা ভেবেছিস, তা নয়। পালাচ্ছি নে। মানুষ-জন ডেকে দলসুদ্ধ ধরতে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুই নজর রাখ।... আসছি।

হলধর সরে পড়ল।

বিশু। হুঁ-হুঁ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশা তাড়াই আর কি!

লাঠি বাগিয়ে বিশু টিপি-টিপি চলল।

[নেপথ্যে বিশু। কি বাছাধন!]

[নেপথ্যে কান্ত। ও হো-হো—মেরে ফেললেছে।]

হলধর এল।

হল। কান্ত না? মার্, মেরে ফেল্ নচ্ছার বেটাকে।……ওরে শয়তান, এই তোর অসুখ? আরও মার্—

ক্ষান্ত কান্তকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল। কান্তর মাথা ফেটে রক্তের ধারা বইছে।

ক্ষান্ত। আর মেরো না—রক্ষে কর। অসুখই সত্যি। দাদা সজ্ঞানে যায় নি গোমস্তা মশায়, ক্ষিধের টানে টানে গিয়েছে। ওর জ্ঞান ছিল না। মেরো না—মরে যাবে।

বিশু। ভির্মি লেগেছে—

হল। ভিরকুটি। বুঝলি নে, ছুতো ধরেছে। ঘাড় ধরে ঝেড়ে দে আর গোটাকতক পিঠের উপর—

ক্ষান্ত। মাথা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। দাদা যে পড়ে গেল!

কান্ত সত্যিই ঢলে পড়ল।

হল। অ্যাঁ? …তাই তো! তোরই দোষ, বিশে। রোগা মানুষ, কার হুকুম মতো তুই মারতে যাস? আমি খোদ উপস্থিত রয়েছি—আমি কি বলেছি? থানা আছে, পুলিশ আছে, হেপাজৎ করে দিবি—

ক্ষান্ত। ওরে, কে কোথায় আছ—দাদাকে মেরে ফেলেছে এরা—

সেই বোঝা কাঁধে রহিম এল; সঙ্গে আমিনা।

রহিম। গোলমাল কিসের? কি হয়েছে?

হল। রহিম?

রহিম। হাঁ, রহিম।…আর এস্তাজারির ধার ধারি নে। ঘর পুড়িয়ে দিয়ে এসেছি। মুনফা করবে কি—শুধু যে পোড়ামাটি!

ক্ষান্ত। দেখ রহিম-ভাই, দাদাকে মেরে ফেলেছে, দেখ—

রহিম। ছাড়ো—সরে যাও বলছি। কেঁদো না, দিদি। এই আবাদে একদিন আমার নানা আর তোমার বুড়ো-দাদা এক মাচায় বসে বাঘ তাড়াত। আবার আমরা মিলে মিশে যত দুষমন আছে, তাড়িয়ে দেব। পালাচ্ছ কোথায়? কান্ত-ভাই মরে তো জবাবদিহি করতে হবে।

হল। চোর-ছে্যাচড়কে মারবে, তার জবাবদিহি কিসের?

শশাঙ্ক ও যামিনী প্রবেশ করল।

শশাঙ্ক। চোর? কে চোর—শুনি?

রহিম। উঠোন থেকে কান্তরামের গতর-ঘামানো ধান নিয়ে যেতে এসেছে—আর চোর হল কান্ত!

হল। হয় কিনা জিজ্ঞাসা করে দেখ্ তোদের মুরুব্বিকে। আপনি তো অঢেল আইন পড়ে পাশ করে বসে আছেন। শুনুন, সকল বৃত্তান্ত। এস্টেট থেকে আমরা ওর যাবতীয় ফসল ক্রোক করেছি। তা সত্ত্বেও রাত্তির বেলা ধান সরাচ্ছিল। আইনের কোন্ ধারায় এটা পড়ে, বলে দিন।

শশাঙ্ক। আর একটা বড়-আইন আছে হলধর, সকল মানুষের বেঁচে থাকবার অধিকার—

এই সময়ে আকবর আলি ও কতকগুলি চাষী এসে উপস্থিত হল।

আকবর। একটুখানি ভাল আছ, অমনি উঠে এসেছ? সর্বনেশে মানুষ তুমি! ডাক্তারদের গুলে খাওয়ালেও তোমার অসুখ সারবে না—

শশাঙ্ক। তা এত মানুষ দল বেঁধে এসেছ আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে?

আকবর। এদের নিয়ে যাচ্ছি যোধকর্তার কাছে—

রহিম। কেন?

আকবর। দিন-মজুরি করে খায় বেচারারা। সারাদিন বেগার খাটিয়েছে—সন্ধেবেলা বিদায় দিল। ভেবেছে কি এরা? নেমন্তন্ন খাওয়াতে সবাইকে বিয়েবাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

শশাঙ্ক। চলো—চলো। আমারও যে নেমন্তন্ন। কান্তরাম, যাবে নাকি?

কান্তরাম ঘাড় নাড়ল।

শশাঙ্ক। না থাক। কান্ত, একে শুইয়ে দাও। ভয় নেই, সেরে যাবে।

আকবর। কিন্তু তোমার যাওয়া চলবে না, শশাঙ্ক-ভাই। গোল-মালের মধ্যে কিছুতে তোমায় যেতে দেব না। তোমাকে সেরে উঠতে হবে।

শশাঙ্ক। নেমন্তন্ন যে আমি অনেকদিন খাই নি—

আকবর। আঁধারের মধ্যে একটিমাত্র উজ্জ্বল আলো—তোমার জীবনের অনেক দাম। তুমি বাড়ি ফিরে যাও—

শশাঙ্ক। ফিরে যাব? [illegible] আলো! না। আমার সাধনা, যার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পণ করেছি, তার থেকে ফিরে যেতে বলছ আকবর আলি?

আকবর। এসব ছোটখাটো ঘরোয়া ঝগড়া, ভাই। তুমি চেয়েছ দেশের স্বাধীনতা—

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, স্বাধীনতা। মিথ্যে ভয় থেকে স্বাধীনতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বাধীনতা, মানুষের মতো বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা কান্তরামের, রহিম মিঞার, তোমার, আমার, সকলের। মহেশ্বর-কোম্পানিকে এসেমব্লিতে পাঠিয়ে ইংরেজের বিপক্ষে কড়া কড়া বক্তৃতা করানো—আর তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের জন্য ভাল ভাল কতকগুলো চাকরি বাগানোর স্বাধীনতা নয়—

বিয়ের বাসর। প্রবীরের পাশে বধূবেশিনী অরুন্ধতী। অনেক মেয়ে ভিড় করেছে। তার মধ্যে একটির প্রায় কনুই অবধি চুড়ি পরা —নাম মনোরমা।

মনোরমা। ও বর, গান গাইতে হবে। ঘাড় নাড়লে শুনছি নে।

প্রবীর। ঘাড় নাড়ব কেন? কাপুরুষ ভেবেছেন? নিশ্চয় গাইব। বাজান—আপনি বাজাতে শুরু করুন।

সুনন্দা। বাজাতে ও পারে না—

প্রবীর। যা পারেন, তাতেই চলবে। গানেই টেনে নিয়ে চলবে বাজনা।

মনোরমা। বাজাব কি? কি আছে এখানে?

প্রবীর। চুড়ি বাজান। আজ্ঞে হ্যাঁ—চুড়ি। ওতেই চলবে।

মনোরমা। হাতীপোতার বাড়ির চুড়ি—নিরেট জিনিষ। এ বাজবে না।

সুনন্দা। বকামি কোরো না। সবাই মিলে বলছি, গাও না একটা কিছু—

প্রবীর। গাইব?

সুনন্দা। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। কত আর বলব?

প্রবীর। দুয়োর এঁটে দিন তবে। আমার কি, আপনারা সামলাতে পারলে হয়। ধরলাম তা হলে—

(গানের সুরে) একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ তো যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল।

সুনন্দা। থামো ভাই, থামো।·· ছটফট আমরাও করছি—

প্রবীর। ভারি অন্যায়। গানের মাঝখানে গণ্ডগোল করেন কেন? এখনো অনেক আছে—

(গানের সুরে) বাঘ ছটফট করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর ছটফট করিতে লাগিল। তারপর ছুটাছুটি করিয়া সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলে, গলার হাড় বাহির করিয়া দাও। ভাই রে, রক্ষা করো—রক্ষা করো—

সুনন্দা। হাতজোড় করে আমরাও বলছি—ভাই রে, রক্ষা করো—রক্ষা করো—

প্রবীর। রক্ষা পেতে চান তো এক্ষুনি আপনি গান ধরুন—

সুনন্দা। আমি কি তেমন—

প্রবীর। বিনা ভূমিকায়। নইলে আমার গান চলল আবার—

(গানের সুরে) তখন বকপক্ষী বাঘের কাতর আবেদনে করুণার্দ্র হইয়া—

সুনন্দা মৃদুকণ্ঠে একটা গান গাইল।

মনোরমা। এবারে একটা কথা বল দিকি, ভাই। পছন্দ হয়েছে ?

প্রবীর। পছন্দ ?

সুনন্দা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। মনে ধরেছে কি ?

প্রবীর। তা অপছন্দের কি আছে বলুন। দামি আসবাবপত্র, গা-ভরা হীরের গয়না···এ সমস্ত অপছন্দ করবে, সে তো আস্ত গাধা।

সুনন্দা। এ তো নিন্দে কথাই হল, ভাই—

প্রবীর। নিন্দে কি বলছেন, দিদি ?

সুনন্দা। বড় স্কলার তুমি—বইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে যদি বলো, মলাট খুব ভাল—সেটা বইয়ের নিন্দে হল কিনা বলো। এখানে অবশ্য বইয়ের কথা নয়, বউয়ের কথা।

প্রবীর। বউ আপনাদের তরফের মেয়ে বলে তাকে স্নেহাই

দেবেন, আর আমি পরের ছেলে—আমাকেই সব ঝকি পোহাতে হবে, আমি গান গাইব, আপনাদের জেরার জবাব দেব, এ কেমন বিচার বলুন বিয়ে তো একলা আমার হয় নি, অরুন্ধতীরও হয়েছে। তার জবাবটা আগে শুনব।

সুনন্দা। বিয়ের কনে কিছু বললে তোমরাই দুষলে, দেখ—মেয়েটা কি রকম বেহায়া!

প্রবীর। কথা না বলে, মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিক!…উহু-হু! দিদি, চিমটি কাটছে—ঘোরতর চিমটি—

অরু। মিথ্যে কথা।

প্রবীর। কথা বলে ফেলেছে, কথা বলে ফেলেছে। তাহলে আর কি! স্পষ্ট করে বলে দাও, সবাই শুনে যান—সেই একদিন যেমন বলেছিলে।…বলবে না? কথাটা ফাঁস করে দিই তাহলে? যেদিন বাতি ধরে আপনাদের এই জমিদারি-চক্কোর থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, সেই সময়ে বলেছিল— আমাকে ওর খুব—খু-উ-উ-ব পছন্দ। দেখুন, ঐ দেখুন—জিভ বের করে ভেঙচাচ্ছে।

অরু। মিছামিছি লাগাচ্ছে আমার নামে—

মহেশ্বরের স্ত্রী চন্দ্রমুখী প্রবেশ করলেন।

চন্দ্রমুখী। তোরা মা, এইবার একটু ছেড়ে দে। খাবার দিচ্ছে।

সুনন্দা। এখানে দিতে বলো, মামি-মা। আমরা সামনে বসে খাওয়াব তোমার জামাইকে। আজকে ছুটি নেই।

চন্দ্রমুখী। ঠাকুর, এখানে নিয়ে এসো তবে—

প্রকাণ্ড থালা ও অনেকগুলো বাটি নিয়ে রসুয়ে বামন এল।
চন্দ্রমুখী সাজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

প্রবীর। বাপ রে বাপ—থালা না দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর? বাটির মধ্যে আমিই ঢুকে পড়ে স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারি।

মনোরমা। এ আমাদের হাতীপোতার বন্দোবস্ত। জামাই খাওয়ানোর বাসন—

প্রবীর। কিন্তু জামাইও যে মানুষ—হাতী নয়।…সর্বনাশ, এত দিয়ে গেছে— এ যে বিশজনের খোরাক!

মনোরমা। এতেই আঁতকে উঠলে? আমার বড় কাকা যে এক একবেলায় পুরো একটা পাঁঠাই শেষ করে দেন।

প্রবীর। হাতীপোতায় পাঁঠার বড় দুর্দিন তা হলে?

মনোরমা। টাকা খরচ করে তাই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।

অরু। (মৃদু কণ্ঠে) জামাই করে—

সকলে হেসে উঠল।

প্রবীর। খবরদার!

সুনন্দা। এসব এ-বাড়ির দস্তুর, ভাই। এককালে বড় জমিদার ছিলেন, সেই জমিদারি ঠাট চলে আসছে।

প্রবীর। বিশভাগের এক ভাগও খেতে পারব না। সত্যি বলছি, নষ্ট হবে। তুলে নিন।

মনোরমা। নষ্ট হবে কেন? কত কুকুর বিড়াল রয়েছে—

অনেকদূর থেকে আওয়াজ আসছে— ফটক খোল' 'আমরা ঢুকব'…ইত্যাদি।

মনোরমা। শুনছ না? ঐ শোন—ঐ শোন—

প্রবীর। কুকুর কেন হবে? মানুষ…গণ্ডগোল হচ্ছে—

মনোরমা। হ্যাঁ—মানুষ! রাস্তার ভিখারি আবার মানুষ নাকি? শোন না, কেঁউ কেঁউ করছে—

প্রবীর। কেঁউ-কেঁউ? গণ্ডগোল…অনেক মানুষের বচসা—

সুনন্দা। ব্যস্ত হয়ো না, ভাই। ওরকম এ-বাড়িতে হামেশাই হয়ে থাকে। ঝুড়ি-ঝুড়ি ভাত ফেলা যায় কিনা, রাজ্যের ভিখারি আর পাতি-কাক এসে ভিড় করে। ...ও কি, হয়ে গেল? উঠে পড়লে যে!

মনোরমা। এ রকম পাখীর খাওয়া খেয়ে বাঁচ কি করে?

সুনন্দা। ভয় পেয়ে গেলে নাকি? অমন রোজই হয়ে থাকে—

কিন্তু ব্যাপার উগ্র হয়েছে। মহেশ্বরের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা যায় 'অত লোক; কি সর্বনাশ, কি চায় ওরা?'

সুনন্দা। মামার গলা। মানে, তোমার শ্বশুরের। বাসর ছেড়ে যেতে নেই ভাই, বেরিও না—বেরিও না—

প্রবীর তখন উঠে দাঁড়িয়েছে

অষ্টম দৃশ্য ঘোষকর্তার বাড়ির উপরের হল

মহেশ্বর ও হলধর

মহেশ্বর। কি মতলব ওদের? কি চায়?

হল। বলছে, নেমন্তন্ন খাবে। চিনে-জোঁকের মতো হুজুর, না খেয়ে ছাড়বেই না। ঐ—ঐ রে—ফটক ভেঙে ফেলল—

মহেশ্বর। এক এক সিকি হিসেবে দিয়ে দাও সবাইকে। আমার নাম করে বলো খাজাঞ্চিকে। চলো—চলো—

দুজনে দ্রুত নিচে উঠানে নেমে এলেন। চাষীরা তখন ফটক ভেঙে ঢুকে পড়েছে।

আকবর। সিকি দিচ্ছ ভিক্ষে? যা খাচ্ছে ঐ ভদ্রলোকেরা, ঠিক তাই খাব। ওসব জুগিয়েছি তো আমরা।

হল। শোন আস্পর্ধার কথা। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। কুত্তার পেটে ঘি সইবে কি? রোঁয়া পুড়ে যাবে—

রায়সাহেব। পুলিশে খবর দিন, বেহাই। গেট ভেঙে ঢোকে এত বড় বুকের পাটা! দারোয়ানদের মোতায়েন করে দিন, এক শালাও বেরুতে না পারে।

মহেশ্বর। মার্—চাবকা বেটাদের—হরদম চাবুক লাগা। চোরের আবার ডাগুর গলা? ধান চুরি করবে, আবার চোখ রাঙাতে আসবে?

রহিম। চোর বোলো না। চোপরও! কাস্তের ফাটা-মাথার গরম রক্ত লেগে আছে, টুঁটি চেপে ধরব এই হাতে—

শশাঙ্ক রহিমকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে দাঁড়াল।

শশাঙ্ক। কেন এদের চোর বলছেন, কাকাবাবু? চোর তো আপনারা—

মহেশ্বর। আমরা মানে?

শশাঙ্ক। আপনি এবং আপনার মতো আর যাঁরা আছেন। অন্যের জীবিকা ফাঁকিজুঁকি দিয়ে নিয়ে নবাবি করা যাদের পেশা। ওদের ক্ষেতে ধান হয়, ওরা তা চোখেও দেখতে পায় না। ম্যাজিকে উড়ে এসে আপনার অট্টালিকা হয়, মোটর-গাড়ি হয়, সোনা-হীরা-মুক্তা হয়, পোলাও-কালিয়া চোষ্য হয়—যেমন খুশি ফেলেন, ছড়ান, ভোগ করেন।…কিন্তু কোটি কোটি এরা না খেয়ে থাকবে, আর আপনার অজস্র ভাণ্ডার কিছুতে নিঃশেষ হবে না, এ অবিচার এই চৌর্যবৃত্তি আর চলতে দেব না আমরা—

মহেশ্বর। আমরা চোর?

প্রবীর দ্রুত উপরের হলে বেরিয়ে এল। পিছনে মেয়েরা।

সুনন্দা। বেরুতে নেই ভাই, বেরিও না—বেরিও না—অলক্ষণ। ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, আমাদের কান দেবার গরজ কি? এসো, ঘরে এসো—

মহেশ্বর। শুনুন রায়সাহেব, বলছে কি শুনুন। আপনি আমি সবাই হলাম চোর—

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, চোর। একশবার বলব, চোর আপনারা। বাবু চোর, মহদাশয় চোর। রাতের অন্ধকারে চুপি-চুপি বেরুতে হয় না, আপনাদের চুরি দিনদুপুরে। ধর্ম, সমাজ—সমস্ত আপনাদের পক্ষে। সুশ্রী সুন্দর সুপুষ্ট দেহ—আপনাদের প্রাচুর্যের সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে, যাদের সর্বস্ব চুরি করেছেন তারাই—

রায়। বেশ বলছে হে! ছোকরাটি কে?

মহেশ্বর। আমাদেরই মাতুল-গোষ্ঠীর কুলাঙ্গার। দেখুন না, দলবল নিয়ে সেনাপতি সেজে যেন লড়াই করতে এসেছে।

রায়। সৈন্যদের তেজ দেখ না! কি রকম বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে! যেন এক এক জাঁদরেল পালোয়ান। চামড়ার নিচে শুধু হাড় ক'খানা—তবু যদি রক্তমাংস থাকত একটু বেটাদের!

শশাঙ্ক। সে-সব থাকতে দিয়েছেন নাকি? রক্ত-মাংস কেটে এনে সিন্দুক বোঝাই করেছেন।

মহেশ্বর। এই পাঁড়ে, তেওয়ারি, এই বিশে, হচ্ছে কি? ফটক বন্ধ করছিস না কেন? দড়ি দিয়ে বাঁধ একটা একটা করে—

আকবর। না—না। ভাইসব, তোমরা যা—আমরাও তাই। দশ টাকা মাইনের তোমাদের মনুষ্যত্বকে কিনে ফেলেছে নাকি! তোমাকে আমাকে নিংড়ে শুষে নিয়ে হচ্ছে এই সব খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-স্ফূর্তি।

মহেশ্বর। হারামজাদা হাভাতেদের দল—বলছি, কানে যাচ্ছে না? উঁ, নড়ছিস না যে তোরা? নিমকহারাম!...আচ্ছা, আমি যদি নি এখনো।

মহেশ্বর দুটি বন্দুক নিয়ে এলেন।

মহেশ্বর। ফায়ার করব। দু-দশটা ঘায়েল করে তারপর কথা—

চন্দ্রমুখী, প্রবীর ও মেয়েরা তাড়াতাড়ি নিচের বারান্দায় নেমে এলেন। চন্দ্রমুখী মহেশ্বরের হাত ধরলেন।

চন্দ্রমুখী। ক্ষেপে গেলে নাকি? শুভ-কাজের মধ্যে এ কি কাণ্ড! আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

প্রবীর। (বন্দুক চেপে ধরে) ছাড়ুন, ছেড়ে দিন বন্দুক। শশাঙ্ক, আকবর, কি হচ্ছে এখানে এই সব ক্ষ্যাপামি?

আকবর। প্রবীর? তুমি বর?…নেমে এসো—নেমে এসো আমাদের মধ্যে—

চন্দ্রমুখী। উঠে এসো বাবা। বাসরে চলো। বেরুনো অলক্ষণ।

সুনন্দা। চলে এসো জামাই, চলে এসো—

রহিম। পিছুলে চলবে না। বোঝাপড়ার সময় এসেছে। আমাদের আগে এসে দাঁড়াতে হবে আপনাকে—

আকবর। কোন দিকে যাবে, কমরেড? মাঝের মানুষ তোমরা—কোন দিকে যেতে চাও? উপরে ঝলমলে আলো, সোনায় মোড়া হাতীপোতার উঁচু ঘরের মেয়েরা। নিচে অন্ধকার—সারবন্দি ঐ বুভুক্ষুর দল—জানোয়ারের সামিল।…দু'দিক থেকে বাহু বাড়িয়েছে তোমার দিকে। ডাকছে হাতীপোতা ঐশ্বর্যের মায়া বিস্তার করে—আর ডাকছে ঐ সর্বহারার দল, পরম প্রত্যাশায় মুখের দিকে চেয়ে—

প্রবীর ধীরে ধীরে সিঁড়িতে এল।

আকবর। আনন্দ কর। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

উল্লসিত জনতা। শশাঙ্ক সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে আলিঙ্গন করল প্রবীরকে। উন্মাদের মতো ছুটে এসে মহেশ্বর বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত দিলেন। শশাঙ্ক নিচে গড়িয়ে পড়ল।

প্রবীর। আমারও জায়গা ঐখানে···নিচে, ওদের মধ্যে।

প্রবীর নিচে গিয়ে শশাঙ্ককে তুলে ধরল। দেখা গেল, অরুন্ধতীও নেমে আসছে।

মহেশ্বর। অরু, অরু মা, তুই কোথা চললি ?

অরু। পথ ছাড়ো, বাবা। যেখানে আমার স্বামী রয়েছেন সেইখানে।

নেমে সে জনতার মধ্যে শশাঙ্কর কাছে এল

অরু। শশাঙ্ক-দা, শশাঙ্ক-দা !

শশাঙ্ক। বিয়ের নেমন্তন্ন করে এসেছিলি। তাই এলাম, বোন—

মহেশ্বর। আগুন! বেহাই, সব জায়গায় আগুন ধরে গেছে। মেয়ে-জামাই পর হয়ে গেল।

জনতা তখন নিঃশব্দ, শোকাচ্ছন্ন। শশাঙ্ককে নিয়ে ধীরে ধীরে তারা চলে যায়। প্রবীর এবং অরুন্ধতীও যাচ্ছে।

মহেশ্বর। অরু, অরু মা আমার—

রায়সাহেব। প্রবীর, প্রবীর—

মহেশ্বর। চলে গেল। বুড়ো মানুষ—আমরা যেতে পারলাম না—একা-একা পড়ে রইলাম। বেহাই, কেউ রইল না আমাদের—

বিহ্বলদৃষ্টিতে মহেশ্বর ও রায়সাহেব মিছিলের দিকে চেয়ে রইলেন।

নবম দৃশ্য

শশাঙ্কের ঘর

শয্যায় নির্জীবের মতো শশাঙ্ক। শিয়রে মা। আকবর আলি, অরুন্ধতী, প্রবীর, রহিম ও কাস্তরামকে কোণের দিকে দেখা যাচ্ছে।

শশাঙ্ক। সকালের দেরি কত, মা?

মা। দেরি নেই, বাবা। শুকতারা উঠবে এইবার।

শশাঙ্ক। এখনো ওঠে নি? আঁধারে হাঁপিয়ে উঠছি, মা। চোখ বুঁজলেই গোল গোল আঁধারের কুণ্ডলী চাকার মতো ঘোরে।···মেয়াদ শেষ হয়ে এল, নতুন প্রভাত কি আমি দেখে যেতে পারব না?··· চারিদিকে মা, সোনার আলোয় ভরে যাবে। মানুষ জেগে উঠবে। অন্ধকারের সাপ-বাদুড়-পেঁচা আড়ালে গা-ঢাকা দেবে।

আকবর। কষ্ট হচ্ছে, শশাঙ্ক ভাই?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ ভাই বড় কষ্ট।···সেই যখন একেবারে প্রথম বয়স, তখন থেকে স্বপ্ন দেখছি—পৃথিবীতে আসবে অনন্ত শান্তি, হাসিমুখ নরনারী, সকলের চোখে আশার আলো—ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর শিশু—তাদের কেউ হবে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউ কবি, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ শিল্পী, কেউ ভাবুক—তারা স্বর্গের ফুল ফোটাবে পৃথিবীতে। পশুর হানাহানি শেষ হয়ে যাবে। আসছে···আসছে··· আসছে। কিন্তু আমি দেখে যেতে পারলাম না।···কাঁদছ মা? আমারও কান্না পাচ্ছে। মানুষ ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না। কাছে আয়, অরুন্ধতী। সেই প্রভাত যখন আসবে, তোর শশাঙ্ক-দাকে মনে করবি। ফুর্তির মধ্যে ভুলে যাস নে, ভাই। আর একবার মনে

দেশ—(২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৫০)...বিষয়বস্তুর দিক থেকেও গ্রন্থখানির অভিনবত্ব অনস্বীকার্য্য। বর্ত্তমান গ্রন্থে মনোজবাবু এমন সব নরনারীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন যাঁদের বৈচিত্র্যময় দানে বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাস সুসমৃদ্ধ—অথচ যাঁরা আমাদের লেখক-লেখিকাদের কাছ থেকে সুবিচার পান নি। অবশ্য এই সুবিচার না পাওয়ার কারণ বোধ হয় এই যে, এঁদের অধিকাংশ কার্য্যই ছিল ভূগর্ভনিহিত। ফলে, এঁদের দুঃসাহসিক বৈচিত্র্যময় কার্য্যাবলীর ইতিহাস অস্পষ্ট এবং বর্ত্তমানে বিস্মৃতপ্রায়। 'ভুলি নাই'-এর মারফৎ মনোজবাবু এমনই কয়েকজন দুঃসাহসী বিপ্লবী নেতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন...

যুগান্তর—(২৮শে নবেম্বর, ১৯৪৩) বিপ্লববাদকে কেন্দ্র করিয়া একদা বাংলার তরুণ-সম্প্রদায় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময় বাঙ্গালী যুবকেরা হাসিমুখে জেলে গিয়াছে, ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়াছে; তারপর মত ও পথের পার্থক্য হয়ত বিলক্ষণ ঘটিয়াছে। কিন্তু যাহারা সেদিন জীবন বলি দিয়াছিল, তাহাদের সাধনা তো মিথ্যা নয়; তাহাদের ভোলা যায় না। সেই অগ্নিযুগের পটভূমিকায় লেখক কয়েকটি স্বাধীনতাকামী তরুণ-তরুণীকে লইয়া এই কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে হইল ইহাদের সকলকেই চিনি; কুন্তলদা, উমারাণী, মায়া, সরোজ—সকলেই আমাদের আপনার জন। ইহাদের কাহিনী স্বভাবসিদ্ধ দরদের সহিত ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, এইখানেই মনোজবাবুর কৃতিত্ব।

আনন্দবাজার পত্রিকা—(৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩) বাঙ্গালার বিপ্লব-যুগের কয়েকজন বিপ্লবীর চরিত্র এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বিপ্লব-নেতা কুন্তল সরকার একটি বিপ্লবী দলের নেতা। তাঁহার আহ্বানে এবং তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণে কতিপয় তরুণ-তরুণীকে লইয়া দলটি গড়িয়া উঠে। ঐ দলেরই অন্যতম সদস্য শঙ্কর রায়ের কথার মধ্য দিয়া লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—ঐ দলের অন্যান্য সদস্য-সদস্যা এবং নেতা কুন্তলদার ত্যাগ, দুঃখবরণ, নিষ্ঠা আর তেজস্বিতার কাহিনী।...

পূর্ব্বাশা—(কার্ত্তিক, ১৩৫০)...উনিশ-শ তিতাল্লিশ সালের বাংলাদেশে স্বাধীনতা-আন্দোলনের ধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, স্বাধীনতার আদর্শও এখন স্বতন্ত্র। কিন্তু সে যুগের বিপ্লবী কর্ম্মীরা তাহাদের ধ্রুব আদর্শপ্রীতি ও নিরলস কর্ম্মপ্রেরণার জন্য নমস্য হইয়া থাকিবেন। গ্রন্থকার তাঁহার এই আধুনিকতম

গ্রন্থে কতকগুলি অর্দ্ধকাল্পনিক চরিত্র ও কাহিনীর সাহায্যে প্রাগুক্ত কর্ম্মীদের স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন।...

কাহিনীগুলির কাল উনিশ পাঁচ হইতে উনিশ। কিন্তু রচনাকালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উনিশ শ তিরিশ হইতে পঁয়ত্রিশ সালের সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের কথা গ্রন্থকারের অজ্ঞাতসারে মনে আসিয়াছে।...মৃন্ময়িকা শীর্ষক অংশে উনিশ শ একুশ ও ছত্রিশ মিলিয়া গিয়াছে। তাহাতে একটি বিশেষ সুফল হইয়াছে যে জাতীয় আন্দোলনের গতি যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। পরিশেষে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে বলিষ্ঠ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা পাঠকের মনে বর্ত্তমান দুরবস্থার মধ্যেও আশার সঞ্চার করিবে।

শনিবারের চিঠি—(আশ্বিন, ১৩৫০) নূতন বিষয়বস্তু লইয়া নূতন ভঙ্গিতে লেখা উপন্যাস, দুঃসাহসিকতার প্রদীপ্ত।

Amrita Bazar Patrika :—The book deals with the recent political phase of Bengal. Mr. Bose is perhaps the first of his class to use this romantic but grim period of hide-and-seek game by emotional youths as the theme of his story. But he has executed his task judiciously. The personalities he has introduced are brilliant....Shankar the narrator is vivid, lively and absorbing. Ananda Kishore, Maya, Nirupama are full-sized portraits suffering no weakness in either colour or line. Mr. Bose's style is dignified yet subtle and keeps the reader enthralled.

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত মনোজ-বসুর "ভুলি নাই" উপন্যাস পড়িয়া বড়ই ভাল লাগিল। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে, এই শতকের (খ্রীষ্টীয় কুড়ি শতকের) প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের বিপ্লববাদীদের একটা লক্ষণীয় স্থান আছে। দেশের মধ্যে প্রবল-প্রতাপ বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুসৃত নীতি এবং কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের আকুলতাময় দেশহিতৈষণা, স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁহাদের অসমসাহসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। ভারতবর্ষের নিপীড়িত প্রাণহীন মৃতকল্প জনগণের মধ্য হইতে এইরূপ উদ্দাম এবং অদম্য প্রাণ ও সাহসের উদ্ভব কি করিয়া হইল, তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! এক পুরুষ আগেকার

বোমারু বিপ্লবীদের আজকালকার ছেলেমেয়েরা দেখে নাই, তাঁহাদের কথা শুনে নাই। হয়তো ঐতিহাসিকের দ্বারা সে যুগের সত্য ইতিহাস লেখার সময় এখনও হয় নাই, যদিও উপেন্দ্র, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ পূর্বতন বিপ্লবীরা আংশিকভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনকাহিনী প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের যুগের কথা সাহিত্যিকের দৃষ্টি এড়াইবার নহে; এবং নিপুণ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ইঁহাদের কথায় কিছু কিছু আভাস লইয়া যে চরিত্র-চিত্রণ ও মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়াছেন বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। দেশকে স্বাধীন করিবার দুর্বার চিন্তার ধুনী বুকের মধ্যে অহরহঃ জ্বালাইয়া রাখিয়া যাঁহারা চলাফেরা করিতেন, এই চিন্তার আগুনে যাঁহারা ব্যবহারিক পাপপুণ্যের বিচার এবং মনের কোমল বৃত্তি—স্নেহ-মমতা ভালবাসা এই দুইই যাঁহারা আহুতি দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে শেষ পর্য্যন্ত অদ্ভুতকর্মা হইলেও মানুষই ছিলেন, অনপনেয় মানবধর্মের কারণ তাঁহারাও যে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না মায়া-মমতার গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের ধরা দিয়া ফেলিতেন, তাহা সুগভীর অনুকম্পার সঙ্গে সার্থকভাবে গ্রন্থকার দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সহৃদয় অনুভবী পাঠককে ত্যাগের আত্মবলিদানের এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবধর্মিতার কতকগুলি মর্মস্পর্শী চিত্রণ অভিভূত করিবে। যথার্থ ট্রাজিক নাটকের উপযোগী রসের আস্বাদনও এই বই হইতে তিনি করিতে পারিবেন। এই বইয়ের যে সমুচিত আদর হইয়াছে শুনিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালী পাঠকসমাজকে অভিনন্দিত করিতে ইচ্ছা হয়।

কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—'ভুলি নাই' পড়িলাম। জানি না, আপনার জীবনের সঙ্গে কতটা সম্বন্ধ ঘটনা ও চরিত্রগুলির, তবে অক্ষরে অক্ষরে দরদ যেন উছলিয়া পড়িয়াছে। প্রাসঙ্গিক ক্রমে বলা চলে—এই দরদ আপনার লেখার জীবন-রস।...বইয়ে প্রত্যেক চরিত্রটি নিজের জগতে সম্পূর্ণ—আশা-নিরাশা দিয়া গড়া নিজের নিজের জগতে। আর একটা জিনিষ বইটির মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—সেটা আশার আলো—এত সহানুভূতির সহিত লেখা যে মনে হয়—শত ট্রাজেডির মধ্যেও তাঁদের আশার কথাটাই বড়। শেষ অধ্যায়ে যেখানে আপনি এ কথাটাকে স্পষ্ট করিয়াছেন সেখানটার কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, কলমের গুণে, না বলার চেষ্টা সত্ত্বেও যেখানে সেখানে এই কথা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—সমস্ত বইখানির মূল রস হিসাবে।

Behar Herald :—No new introduction is necessary of Monoj Bose's literary talent. He is a past-artist. Bengali-knowing literary public who are interested in our literature know him full well. His 'Bana Marmar.' 'Narabandh'. 'Prithibi Kader' and 'Debi Kishori' have already stored for him a bag of reputation which will for a long time stand as an object of envy for the so-called Burgeoise entrantees in our literature.

Bhuli Nai is a novel dealing with revolutionary characters of whom Kuntalda is hero. Kuntalda is no dreamer—he is a man of action, of speed and of scientific outlook. He knows full well that speeches, meetings and resolutions are of no avail, strenuous nervous effort and immense sacrifice are necessary for emancipation of the mother-country and for creating a strong foothold for the future children of India. Kuntalda is the central rod round which other revolutionary characters rotate and the success of Kuntalda was deemed by all their own success. Kuntalda to them and to us as well is not only the hero and leader but a true son of Mother India—India that is, and that will be. **Kuntalda is the ideal not of present but of future as well ; say, for all time....**

দুঃখ-নিশার শেষে (২য় সং)

পাঁচ মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। দাম দুই টাকা।

শ্রীসজনীকান্ত দাস—(যুগান্তর ৭।৪।৫১) যাঁহারা 'বন-মর্ম্মর' 'নর-বাঁধ' 'দেবী-কিশোরী' যুগের রোমাণ্টিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন শিল্পী মনোজ বসুর লেখার সহিত পরিচিত, তাঁহারা গত তিন-চার বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত তাঁহার গল্প ও নাটক-গুলিতে পূর্ব্বতন দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শবাদের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিবেন। 'পৃথিবী কাদের' পুস্তকে মনোজবাবুর এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; তিনি স্বপ্নবিলাস পরিত্যাগ করিয়া এই ধূলামাটির পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দলিত পিষ্ট সর্ব্বহারা মানুষের সুখদুঃখের কথা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তাঁহার পাঠকদের কাছে নিবেদন করেন। তাঁহার মতবাদ তাঁহার নিজস্ব, অন্তরের গভীর বেদনা হইতে উদ্ভূত, সর্ব্বপ্রকার ইজ্‌ম-নিরপেক্ষ। এই কারণে তাঁহার লেখা পড়িতে

আমাদের শিল্পবোধ ক্ষুণ্ণ হয় না, রসোপভোগের সঙ্গেই তাঁহার উদ্দেশ্যকে আমরা স্বীকার করিতে পারি।

বর্ত্তমান গল্পসংগ্রহে মনোজবাবুর এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল। সকল গল্পই আমাদের এই বাঙ্গালী জীবনের বাস্তবকঠিন ও বিচিত্র সমস্যার পরিচয় ও সমাধানমূলক সুখপাঠ্য গল্প। আমাদের দুঃখ-নিশার সমাপ্তির দিকেই এগুলির লক্ষ্য। গল্পগুলি শুধু আমাদিগকে আনন্দ দেয় নাই, আমাদেরই এই মাটির পৃথিবীতে অতি পরিচিত মানুষ ও সমাজের মধ্যে আমাদের রসবস্তুর সন্ধান দিয়া আমাদিগকে পরিণাম সম্বন্ধে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। এই মন্বন্তরের দিনে সাহিত্যরস ও বাস্তব প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মনোজবাবুকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রবাসী—(আষাঢ়, ১৩৫১) কাহিনীগুলি সর্ব্বহারা কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্র্যের দুঃখ-দুর্দ্দশা লইয়া রচিত। ধনবৈষম্যে সমাজ-ব্যবস্থার কলুষ কতদিকে এবং কত ভাবেই না আত্মপ্রকাশ করিয়া মানুষের জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে—এগুলিতে তাহা নিপুণ ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

মনোজবাবু শক্তিমান লেখক। অনুভূতি তাঁহার তীব্র, মন দরদী, এই দরদ কোন কোন ক্ষেত্রে ভাববিলাসে পর্য্যবসিত হইয়া এক শ্রেণীর পাঠকচিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। মনোজবাবু সে চেষ্টা মাত্র করেন নাই। গল্প পড়িতে পড়িতে মনে হয়, কৃষক-জীবনের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ আছে। তাই তাহাদের আচার-ব্যবহার, আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ জাড্য মূঢ়তা মিশাইয়া বেদনা-জ্বালাময় ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন। এই বেদনা কোথাও ঘটনা-বিন্যাসে কোথাও সংলাপে কোথাও বা মন্তব্যের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভূমি ও অন্ন-বঞ্চিতের জ্বালা কোন কোন গল্পে এত তীব্র হইয়া ফুটিয়াছে যে, আখ্যানভাগকে অতিক্রম করিলেও গল্প-রস-বিচ্যুত মনে পীড়া জন্মায় না।

Amrita Bazar Patrika (28. 5. 44) The short stories under review mark the mental evolution of a highly sensitive writer Before an overwhelming social tragedy he seems to be ashamed of so long riding the high horse of pure literature and he frankly subordinates his art to propaganda. If he errs he errs on the side of truth. He deserves our deepest sympathy as an artist who

torn from the moorings of the past is struggling to adjust himself to new conditions of life. When the turbulence of transition has settled down and art has come to its own in life, these martyrs will be gratefully remembered as harbingers of a new intellectual order.

তা অত্যন্ত দুর্লভ। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেছেন—It is a departure in the fiction-literature of the province—ইহা অতিশয়োক্তি নয়। দ্বিতীয় সংস্করণে বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট অতি অভিনব হয়েছে। দাম দেড় টাকা।

Amrita Bazar Patrika :—As the title of the book suggests Mr. Bose—a reputed writer—has tried herein and in course of five other vivid and illuminating stories to look at the eternal question of "Haves" and "Have-nots"....

Mr. Bose's treatment of the subject is artistic and readers will find in the volume—a lively and vigorous study of Bengal's rural problem—cent per cent refreshing. **It is a deparure in the fiction literature of the province.** The first story...culminates in the couple absconding from their native village. But before they do so they enjoy the malicious pleasure in setting their cottage, in building which they spent their all energy, to fire. On the road to No Man's Land Saudamini is bitter but is not "proletarian". She curses her lot and says that next time when she would be face to face with her Creator she would demand from Him an answer—if the earth has been divided amongst others why do You send us there ?—a typically Indian answer to the most topical and perplexing question that humanity has ever been faced with.

Mr. Bose's style is sensitive and poetic and never does he commit the fatal mistake of taking sides and so the readers' sympathy remains where the anthor intends them to rest.

আনন্দবাজার পত্রিকা—....দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন লইয়া বহুলোক নাড়া-চাড়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাংলার কৃষক-জীবন লইয়া খুব বেশী লেখক আজ পর্য্যন্ত লেখনী ধারণ করেন নাই। মনোজবাবু যে বহু-কর্ষিত পথে না যাইয়া নূতন ক্ষেত্রের সন্ধানী হইয়াছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।... আলোচ্য বইখানি হাতে লইলেই বইখানার নাম প্রথমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সমাজের মর্ম্মমূলে আজ যে প্রশ্ন জাগিয়াছে, এই নামটুকুর মধ্য দিয়া লেখক সেই প্রশ্নকেই রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সৌদামিনী অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষকের বউ হইলেও অসাম্যের বিরুদ্ধে আজ জগতে

যে আন্দোলন মাথা তুলিয়াছে, তাহার ঢেউ তাহার বুকেও আসিয়া লাগিয়াছে। ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার শক্তি তাহার নাই, কিন্তু চিন্তা করিবার তাহারও একটা প্রণালী আছে।...মাটির সঙ্গে যে কৃষক-জীবনের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, মনোজ বাবু তাহা সফলতার সহিত দেখাইতে পারিয়াছেন।...মানুষের হৃদয়ের উপর গল্পগুলি গভীর ছাপ রাখিতে পারিবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

নূতন প্রভাত (২য় সং)

বাংলার প্রথম প্রগতি-নাট্য। হিন্দু-মুসলমান ও কৃষক-জমিদার সমস্যা নবীনতম চিন্তার আলোকে দেখান হয়েছে। যাঁরা গণচেতনা উদ্বোধনে প্রয়াসী, মহাচীনের মতো—রাশিয়ার মতো সর্বত্র এই নাটকের অভিনয় করবেন। দাম দেড় টাকা।

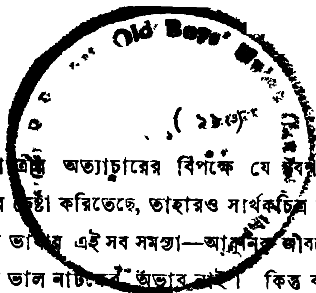
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী—মনোজ বাবু যে নূতনত্ব করেছেন, তা গতানুগতিক নাটকীয় প্রথা নয়। এই ধরণের প্রচেষ্টার তিনি মুখপাত করলেন বলতে হবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র—'নূতন প্রভাত' নাট্যসাহিত্যে যুগোপযোগী অবিস্মরণীয় অবদান। হিন্দু ও মুসলমানের এক স্বার্থ—এই ছবি নাটকে সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত। এই ধরণের নাটকেরই আমরা কতকাল ধরে প্রত্যাশা করছি। সর্ব্বত্র এই নাটকের অভিনয় হোক।

শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—হে নিপুণ শল্যবিৎ, অস্ত্রোপচার আপনি যথাযথ স্থানেই করিয়াছেন। ব্যথা পাইয়াছি প্রচুর। চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষত আরোগ্যান্তে নূতন স্বাস্থ্যলাভের প্রত্যাশায় আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না—শুদ্ধ আমার পক্ষ হইতেই নয়—সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃথিবীতে আবহমান কাল ধরিয়া মানুষ মানুষকে স্বার্থপর ভাবে নিজের কাজে লাগাইয়াছে—কোথাও অজ্ঞানে, কোথাও সজ্ঞানে। অজ্ঞানেই হোক বা সজ্ঞানেই হোক, এই স্বার্থপরতার সূত্র ধরিয়া, আধুনিক বিচার অনুসারে, মানুষকে দুটী শ্রেণীতে ফেলা যায়—যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গে, আর যাহাদের মাথায় কাঁঠাল

ভাঙ্গা হয়। আধুনিক কালে বিজ্ঞানে ও বিদ্যার যুক্তি ও কৌশলে এই ব্যাপার অতিশয় ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং কেবল যে এক সমাজের মধ্যে মানুষ মানুষকে বা মানুষের একদল আর একদলকে এইভাবে শোষিত ও নিপীড়িত করিতেছে তাহা নহে, জাতিগতভাবে একটি জাতি সমগ্র আর একটি জাতির উপর এই ধরণের অত্যাচার চালাইতেছে। সাম্যবাদের কৃতিত্ব এইখানে, যে স্বার্থান্ধ শোষক ও নিপীড়ক মানুষ ও জাতির মুখের মুখস এই মতবাদ খুলিয়া দিয়াছে; এবং শোষণ-নীতির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতে নিপীড়িত জাতির মুক্তিকামীদের চেষ্টাও কম কার্য্যকর হয় নাই। শোষণনীতি নিজের পথ নিষ্কণ্টক রাখিবার জন্য সব-কিছুরই সাহায্য লইয়াছে, লইতেছে, এবং লইবেও; ধর্ম ইহাদের কাছে একটি অতি সহজ-লভ্য এবং শক্তিশালী আবরণ, বিশেষতঃ যদি মূর্খ এবং অসহায় শোষিত জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলোকের পরিবর্তে ধর্মান্ধতার অন্ধকার বিদ্যমান থাকে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ধর্মের খোলস পরিয়া থাকিলেও এবং স্বার্থান্ধতায় সেই খোলসকে সত্য বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিলেও, ধর্মধ্বজী শোষকগণ বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম (অথবা রাষ্ট্রনীতি) মানিলেও, ইহাদিগকে সমধর্মী বা এক জাতির মানুষই বলিতে হয়। আজকাল পৃথিবীর অন্য দেশের মত ভারতবর্ষে এবং বাঙ্গালাদেশেও এই শোষক জাতির লোকদের একটি প্রবল দল ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া দেশের মূক ও অক্ষম মানুষদের নিজের কাজে লাগাইতেছে। বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণের এবং বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার কারণে, পিতা ও পুত্র, ভ্রাতা ও ভ্রাতা কোনও কোনও স্থলে আর এক জাতির থাকিতে পারিতেছে না। মানুষের মনে নানা সূত্র অতি জটিলভাবে মিলিত হইয়া কাজ করে; কিন্তু সব জট খুলিয়া আসল মনটি বাহির হয়, যখন মানুষ স্বার্থকে (বিশেষ করিয়া অন্যায্য স্বার্থকে) ছাড়িতে বা তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। এই সব সমস্যা আমাদের এই যুগে এত প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে, যে তাহা আমাদের সত্যকার সাহিতিকদের সকলকেই কিছু না কিছু নাড়া দিতেছে। শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর চিন্তায় এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া সম্প্রতি তিনি "নূতন প্রভাত" নামক মনোজ্ঞ নাটকখানিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে রাষ্ট্রশক্তির মারফৎ কার্য্যকর জাতীয় শোষণ-নীতির পাশে, দেশের চিরাচরিত রীতিতে জমিদারী-পদ্ধতির অপকৃষ্ট বিকারের ফল-স্বরূপ অন্য প্রকারের শোষণ নীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের দোহাই পাড়িয়া ইহাদেরই সহোদরা অন্য আর এক ধরণের শোষণ ও দলন নীতি—এই সমস্তকেই নিপুণ তুলিকায় নাট্যচিত্রে দেখানো হইয়াছে।



এই সকল সমস্যা ও অত্যাচারের বিপক্ষে যে যুবশক্তি দাঁড়াইয়াছে ও জনশক্তিকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারও সার্থকচিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। ইংরাজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় এই সব সমস্যা—আধুনিক জীবনের অতি সত্যকার সমস্যা—লইয়া রচিত ভাল ভাল নাটকের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এই ধরণের নাটকের নিতান্ত অপ্রাচুর্য্য—অন্ততঃ আমি এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এইভাবের সত্যদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাঙ্গালায় পড়ি নাই। অভিনয়ে এইরূপ নাটকের সাফল্য ও সার্থকতা হইবেই ; তবে যাঁহারা স্বার্থ ও শান্তি, নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম দুই জড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এ ধরণের নাটক তাঁহাদের পীড়া দিবে।

মনোজ বাবুর নাটকের চরিত্রগুলি ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি হইয়াছে। The way to Hell is paved with good intentions—নরকের পথটা সাধু সঙ্কল্পে মোড়া ; এই উক্তির সার্থকতা পাই কতকটা জমিদার মহেশ্বরের চরিত্রে। তবে জমিদারদের মধ্যে অত্যাচার করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইতেছে ; আগেকার মত দোর্দণ্ড-প্রতাপ শক্তিশালী জমিদার আর নাই, তাঁহারা মহেশ্বরেরই মত শাসক-শক্তির সাহায্য লইয়া আইনের মার-পেঁচের মধ্যে ফেলিয়া প্রজাদের শায়েস্তা করিবার চেষ্টা করেন। Nobless Oblige—পিতৃপুরুষের চারিত্রিক মহত্ত্ব মহেশ্বর যে বুঝিতে পারেন না তাহা নয়। কিন্তু তাঁহার অনুচর হলধর-চরিত্রটীও অতি খাঁটি জিনিষ—lackeydom অর্থাৎ পরপ্রসাদপুষ্ট খ-বৃত্ত জীবের মতিগতি এই চরিত্রে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমিনুল হককে আমরা সহজেই সব জায়গায় ধরিতে পারি। এবং রহিম বাঙ্গালাদেশে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত নানা স্থানে বিদ্যমান আছে বলিয়াই আমরা এখনও ভগ্নোৎসাহ হই নাই। শশাঙ্ক ও মায়ের চরিত্রে যে আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠায় দুঃখবরণের চিত্র দেখিতেছি, তাহা এই অভিশপ্ত বাঙ্গালাদেশে বিধাতার একমাত্র আশীর্ব্বাদ ; এবং অরুন্ধতী-প্রবীরের মত ভাবুক ও সত্যদর্শী তরুণবয়স্ক পাত্রপাত্রী আশা করি দেশ হইতে এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। মোটের উপর, "নূতন প্রভাত" একখানি যুগোপযোগী নাটক, সত্যদৃষ্টি ও সত্যভাষণের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—(অরণি, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪)...নবনাট্য আন্দোলন সহর হইতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িলে সমাজ-জীবনের বিবর্ত্তনের গতিকে দ্রুত করিবে। বাঙ্গালার শক্তিশালী লেখকগণ এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সুসাহিত্যিক এবং

ঔপন্যাসিক শ্রীমনোজ বসু এইকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। 'নূতন প্রভাত' তাঁহার এই ধরণের প্রথম নাটক। গণ-আন্দোলনের পটভূমিকায় পল্লীর কৃষক-জীবনের সমস্যা লইয়া নাটকখানি রচিত। প্রগতিশীলতার সহিত রক্ষণশীল গতানুগতিকতার দ্বন্দ্ব—সংস্কৃতিবান বৈপ্লবিকভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত যুবকদের নেতৃত্বে শ্রেণীস্বার্থ-সচেতন কৃষকশ্রেণী সাম্প্রদায়িকতার মোহমুক্ত মন লইয়া কিভাবে স্বাধিকার রক্ষা ও অর্জ্জন করিতে পারে—ইহাই নাটকের মর্ম্মবস্তু। জমীদার, দারোগা, গোমস্তা, সরকারি উকীল প্রভৃতি চরিত্রগুলি এত বাস্তব হইয়া ফুটিয়াছে যে, ইহাদের অনায়াসেই চেনা যায়। নীচতা, ভণ্ডামি, স্বার্থলোভ, চরিত্রভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে জাগ্রত সমাজ-মনের অভিমান ও অভিযান ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে ভাবী সমাজের ইঙ্গিত নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন, অন্ধকার ক্লিষ্ট পল্লীজীবন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।...অভিনয়োপযোগী ভাষার চাতুর্য্যে পাঠকের (এবং দর্শকদেরও) মনে কৌতূহল শেষ পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকে। Type চরিত্র সৃষ্টিতে মনোজবাবু যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশান্বিতচিত্তে তাঁহার নিকট এই শ্রেণীর আরও নাটক প্রত্যাশা করিব। কৃষক-সমাজে অন্যায় ও দীর্ঘস্থায়ী অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায়বুদ্ধি ও সঙ্ঘশক্তি জাগ্রত করিতে এই শ্রেণীর নাটকের উপযোগিতা রহিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

Amrita Bazar Patrika—Sj. Monoj Basu has already made his name as a delighiful writer of fiction with special aptitude for delineating village life. He has acute observation, large fund of sympathy and idealism. In the result he has acquired a thorough understanding of the true nature of the problems and the agitations of our workers on the soil. In this drama, **which we believe is the first of its kind**, he has painted a flaming picture of the awakening among our agricultural classes and their struggle against the deep-rooted and traditional oppression of landlordism. The hero of the drama is Sasanka, a worker among the masses, who returns from prison with broken health to find the landlord of the village a relation and a man belonging to the same class of society, more determined in his tyrannical activities. There is communalist propaganda among the peasants, to make matters worse. The conflict which is thus precipitated ends in the death of the hero

from assault by the landlord's men. This is a problem play and underlines the proposition that Hindu and Muslim interests are basically identical, being economic in fundamental character. **In courage of portrayal, realism and swiftness of action this drama has achieved a high watermark of merit.** (5. 3. 1944).

যুগান্তর—সুপরিচিত কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার মনোজ বসুর এই নূতন নাটকটি সাহিত্য-পাঠক এবং নাট্যামোদী সম্প্রদায় কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পটভূমিতে দেশের বাস্তব দুঃখ-দৈন্যের স্বরূপ নিপুণভাবে। উদ্ঘাটিত করিয়া লেখক তাহা দূরীভূত করিবার পন্থা দেখাইয়াছেন—কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যকে ছাপাইয়া ইহার নাটকীয় রস ও সুষমাই বড় হইয়া ফুটিয়াছে। পেশাদার ও সৌখীন রঙ্গমঞ্চ এই নাটকের অভিনয় করিলে তাহা একাধারে দেশে যেমন নূতন চিন্তা-বিস্তারের, তেমন উন্নত রুচির নাটকাভিনয় প্রবর্ত্তনের সহায়ক হইবে। বইটির বহুল প্রচার কাম্য। (২৬।৩।১৯৪৪)

প্লাবন (২য় সং)

তিন অঙ্কে সমাপ্ত আধুনিক নাটক। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে 'নাট্য ভারতী'র পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বহু দিন এই নাটক অভিনীত হয়েছে। পল্লী-অঞ্চলে অভিনয়ের সুবিধার জন্য নাটকে পৃথক নির্দেশ দেওয়া আছে। সাহিত্য হিসাবেও অবিস্মরণীয়। দাম দেড় টাকা।

যুগান্তর (২২শে আগষ্ট, ১৯৪১)—নাট্যভারতীর নবতম অবদান খ্যাতিমান সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'প্লাবন'। নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপি-চাতুর্য্যে সুদক্ষ শিল্পিমণ্ডলীর সুন্দরের সাধনার মাঝে নব নব বিস্ময়ের উন্মোচন রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। অজানার উদ্ঘাটনে কৌতূহলী দর্শকদের আবিষ্ট করিয়াছে।...জমিদারের শোষণে প্রজার মর্মপীড়াজাত সদ্য-লব্ধ চেতনার মাঝে কৃষকের স্বকীয় দাবী প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা, কৃষককর্মী কমলেশের প্রতি শহরের কৃত্রিম জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত বিলাস-পালিতা জমিদার-কন্যা সবিতার বিরূপ মনোভাব ঘনিষ্ঠতায় আশা-উজ্জ্বল রূপান্তর, কমলেশের জাদু-স্পর্শে পল্লীর স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতি সবিতার মমত্ব-বোধ, দিক্-ভাসানো প্লাবনের ভয়াবহ নৃশংসতা নাটকের কাহিনীকে

উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। সমাজ-কাঠামোর প্রাণহীন কৃত্রিমতার প্রতি ব্যঙ্গের কশাঘাত ও নিপীড়িত জনগণের দুঃখ-মোচনের ঐকান্তিকতা লীলায়িত হইয়া নাটকখানির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।...

বনমর্ম্মর (২য় সং) নরবাঁধ (২য় সং)

'বনমর্ম্মর' ও 'নরবাঁধ' সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বই দু-খানি সর্বত্র সমাদৃত। 'বনমর্ম্মর'-এর প্রথম সংস্করণ প্রবাসী কার্য্যালয় থেকে ছাপা হয়; এই প্রথম-লেখা বইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

বই দু-খানার প্রথম সংস্করণ বহুকাল নিঃশেষিত হয়েছিল। আমরা পুনর্মুদ্রণ করেছি। 'নরবাঁধের' অনেক অংশ পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। বনমর্ম্মরের দাম ২।০; নরবাঁধের দাম ১৸০। কয়েকটি মাত্র সমালোচনার সামান্য অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হল—

বনমর্ম্মর সম্বন্ধে—

Shree Guru Saday Dutt—To read Manoje Basu's short stories is to feel unmistakably that a new force has emerged in the sphere of Bengali fiction. We have been treated to a plethora of sickly sentimentality and didacticism, a surfeit of shameless sensuality and sexualism, veiled and unvelied and an insensate craze for novelty for the sake of novelty and tor studied mysticism in thought and language. Here we find a different article; clarity of conception, forcefulness of delineation and fidelity to life—the very flesh and blood and bone of healthy fiction you have here in abundance; you have happy turn of idea in expression and the sparkling flash of dialogue too in refreshing profusion;—but what is more important—you have also the enchanting atmosphere of romance and above all and to crown all—a pervading spirit of lofty idealism which comes as a healing balm of the soul.

A delightfully unstudied simplicity of diction, an innate sincerity of emotion and a vivid and true-to-type character-delineation meet you here at every turn,—while instead of a laboured attempt at psycho-analysis, which is the prevailing fashion of the day, you

have lightning touches of dialogue and expression which reveal to you in a flash the hopes and fears, the strength and weakness and the beauty, sweetness and simplicity of soul of the men and women who people this dear land of Bengal. In short, you have here a truly national story-teller who promises to give you the very stuff that your soul and the nation's soul is yearning for to-day.

I cannot vouch for what you want, but for my part I cry—give me Bankim, give me Sarat, but after that—for God's sake give me Manoje !

পরিচয়—যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্য্যায়ে গিয়া পৌঁছায় তাহা মনোজ বসুর আছে।...

প্রবাসী—বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের নদীমাঠবনের ছবি প্রবাসী বাঙালীকে home-sick ক'রে তুলবে।...

বিচিত্রা—সরল, অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর জীবনের সহস্র দুর্ব্বলতা, অতি সাধারণ জীবন-যাত্রার অতি তুচ্ছ ঘটনাবলী ও অতি সামান্য অনুভূতিগুলি লেখকের প্রাণের গভীর দরদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।...

নবশক্তি—অত্যন্ত ছোট চরিত্রকেও অল্প কথায় এমন চমৎকার ফুটাইয়া তুলিতে যিনি পারেন, তিনি যে সুদক্ষ কথাশিল্পী এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ..

নরবাঁধ সম্বন্ধে—

প্রবাসী—যে অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভাবান লেখক একেবারে জয়-পতাকা লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামেন, শ্রীমনোজ বসু তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। এঁর ব্রত বাংলাকে বাঙালীর কাছে পরিচিত করা। দেশের অন্তর্লক্ষ্মীর পরিচয় পাইতে হইলে যেখানে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে, সেই মর্ম্মস্থলটির পথ লেখকের ভাল ভাবে জানা আছে।

লেখার সঙ্গে এমন একটি অপরূপ সরসতা আছে যে, যে বিস্ময় আর আনন্দের সহিত ছেলেবেলায় রূপকথা শোনা যাইত, বইখানি পড়িবার সময় তাহারই যেন একটা আবছায়া স্মৃতি স্ফীত হইয়া উঠে। চরিত্রগুলি খুব সজীব, ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া ঘুরে...

Dr. Nihar Ranjan Roy—Mr. Basu's short stories furrow new ground ; they are far out of the common run...To the Bengali readers his portrayal, his characterisation and interpretation of Bengali life are as real and as much telling as anything on the face of this earth. Mr. Basu has ideas and imagination ; which he knows how to translate in simplest and clearest possible manner

into expression, that has a ring of sincerity. He has also depth of thought which does not weigh heavily on the readers. Last of all he has a fine gift of narration of a born story-teller.

মাতৃভূমি—(ফাল্গুন, ১৩৫১) রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা-সাহিত্যে মৌলিক ছোট গল্প লিখে যে কয়জন বাঙ্গালী লেখক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, মনোজবাবুকে নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম বলে ধরা যায়। পরলোকগত শরৎচন্দ্রের মত মনোজবাবুও বাংলার মাটির অকৃত্রিম সৃষ্টি। বাংলার পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ, যোগসূত্র নিবিড়। বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে রচিত তাঁর সাহিত্য তাইবাঙ্গালী মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়ে যায়। বাংলার শ্যামল শ্রীর মত তাঁর রচনার শান্ত মাধুর্য অতি সহজেই আমাদের হৃদয় আকৃষ্ট করে।

লেখকের অন্যান্য পুস্তকের মত 'নরবাঁধে'ও তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর সন্ধান পাই।...এর পটভূমিকা বেশ বড়। মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্বেও বাংলার গ্রামের যে ঐশ্বর্য ও শান্তির কথা আমরা শুনি, ধীরে ধীরে কি ভাবে তার মৃত্যু হয়ে, বাংলার গ্রাম বর্তমানের দুর্দশা-ক্লিষ্ট অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, লেখক তারই পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। যন্ত্র-যুগের অগ্রগতির সঙ্গে গ্রামবাসীরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি—অথচ তার প্রভাবকেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই প্রধান উপপাদ্যের সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন পল্লীজীবনের হিংসা ও কুশ্রীতায় বিষাক্ত পারিপার্শ্বিকের চিত্র। অথচ তাঁর লেখা প'ড়ে কোথাও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না—বরং অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণের অসহায়তায় হৃদয় বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এইখানেই লেখকের বৈশিষ্ট্য। তাঁর সংবেদনশীল দৃষ্টির সামনে বাংলার পল্লী-জীবনের বহিরাবরণ খুলে পড়েছে। বাংলার পল্লীজীবন উন্নত হোক—আশাবাদী লেখকের এ অভীপ্সা যেন গল্পটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। ..

...প্রতিটি চরিত্র সাক্ষ্য দেয় যে মনোজবাবু যে-জীবন সম্বন্ধে গল্প লেখেন, তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ এবং নিবিড়। যে অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার থেকে তাঁর সাহিত্যের সৃষ্টি, তার অপ্রাচুর্য নেই কোথাও। . প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত—তারা যেন আমাদের চোখের সামনেই কথা বলে ; বাংলার পল্লীজীবনের বিভিন্ন সমস্যা—তার অন্তর্নিহিত মাধুর্য এবং বহিরাবরণের কুশ্রীতা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হয়ে উঠি। 'নরবাঁধ' কে বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাদের তৃপ্তি বিধান করবে এবং নতুন করে দেশ সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলবে—এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।